আউযুবিল্লাহের হাকীকত

আবদুল গাফ্‌ফার

আউযু বিল্লাহের হাকীকত

আবদুল গাফ্‌ফার

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২৮২

৮ম প্রকাশ (আধুনিক ৭ম প্রকাশ)
শাবান ১৪৩৬
জৈষ্ঠ ১৪২২
মে ২০১৫

বিনিময় ঃ ২৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

AUJU BILLAHER HAKIKAT. by Abdul Gaffar. Published by Adhunik Prokashani, 25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 25.00 Only

www.pathagar.com

ভূমিকা

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শরু করছি। যিনি মেহেরবান ও দয়াবান। আমার প্রথম লেখা ঃ "আউযুবিল্লাহ" দিয়েই শুরু করলাম। সাহিত্যিকদের ময়দানে বিচরণ করার যোগ্যতা আমার নেই। আল্লাহ যেন তার দীনকে গণমানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা হিসেবে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। এটাই প্রার্থনা।

আমি চেষ্টা করেছি যাতে কথাগুলো সাধারণ মানুষের জন্য বুঝতে সহজ হয়। স্বাস্থ্যবান মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশস্ত দরজা বানালে যেমন চিকন মানুষের জন্য সে দরজা স্বতঃতই উন্মুক্ত হয়। সাধারণ লেখাপড়া জানা অগণিত মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে সহজভাবে লিখা এ পুস্তক উচ্চ শিক্ষিত ও জ্ঞানীদের জন্য তেমনি খোলা। তাঁদের জন্য সাহিত্য রস পরিবেশনের দুরাশা আমি করি নাই। যদি অনুগ্রহ করে তাঁরা পুস্তকটি আগাগোড়া দেখেন, তাহলে সহজ-সরল ভাষায় তথ্য ও তত্ত্বের মাধ্যমে যুক্তি রস কিছু পাবেন বলে আশা রাখি।

পূর্বেই বলেছি, আমি সাহিত্যিক নই। পুস্তক লেখার সময় সুযোগ আমার খুবই কম। কয়েকজন দীনি ভাই বিশেষ করে সুলেখক জনাব মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতি সাহেব আমাকে খুবই উৎসাহ দিয়েছেন আমার বক্তব্যকে লিখিত রূপ দেয়ার জন্য।

প্রিয় ভাই মুহাম্মদ সোলায়মান হোসেন, প্রধান শিক্ষক 'মনিকানন' স্কুল মিরপুর, সম্পাদনার কাজটি করে খুবই সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া আমার পরিবারের সকলেই যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। সকলের সহযোগিতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

যে সকল মানুষের উদ্দেশ্যে পুস্তকটি লেখা হলো, তারা যদি এর মাধ্যমে কুরআন অধ্যয়ন সম্পর্কে কিছু একটু সজাগ হন তবেই আমার এ চেষ্টা স্বার্থক। সকল কৃতকর্মের পুরস্কার দানের মালিক আল্লাহর নিকটই একমাত্র জাজা পাওয়ার আশা। আমীন।

—লেখক

www.pathagar.com

সূচীপত্র

আউযুবিল্লাহর প্রয়োজনীয়তা	৫
কেবল কুরআন পাঠের পূর্বে আউযুবিল্লাহর প্রতি তাকিদ হলো কেন ?	৫
কুরআন পাঠের সময় শয়তানের তীব্র আক্রমণ কেন ?	৬
আদমের বিরুদ্ধে ইবলিসের যুদ্ধ ঘোষণার ইতিহাস	৭
আদম আ. স্বীয় অপরাধ ঢাকার জন্য কি যুক্তি দিতে পারতেন	১১
আউযুবিল্লাহর তাৎপর্য	১৪
বর্তমান মুসলিম সমাজে কুরআন তেলাওয়াতের অবস্থা	১৬
কুরআন শব্দের অর্থ	১৮
কুরআনের মর্ম বুঝার চেষ্টা না করে শুধু সওয়াবের জন্য পড়ে	২৩
তেলাওয়াত শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য	২৮
কুরআনের মর্ম বুঝা ও তাফসীর পড়াকে ক্ষতি মনে করা	৩০
শয়তানের ষড়যন্ত্র	৩৩
কিভাবে শয়তানের ধোঁকা বুঝা যাবে	৩৭
এ দুরবস্থা হতে বাঁচার উপায়	৪৩
কতিপয় প্রশ্নের উত্তর	৪৫

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আউযুবিল্লাহর প্রয়োজনীয়তা

অধিকাংশ কুরআন তেলাওয়াতকারী জানেন যে, কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করার পূর্বে আউযুবিল্লাহ পড়তে হয় কিন্তু এর শরয়ী অবস্থান সম্পর্কে সকলের ধারণা একই রকম নয়। পবিত্র কালামে পাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন ঃ

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

"যখন তুমি কুরআন পাঠ করো তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করো।"–সূরা আন্ নহল ঃ ৯৮

বাক্যটি একটি আদেশমূলক বাক্য। আর এ আদেশ স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের। অতএব স্বাভাবিকভাবেই মনে করা যায় যে, এটা অবশ্য কর্তব্য, সে জন্যই অনেক ওলামার মত হলো কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে আউযুবিল্লাহ পাঠের মাধ্যমে মনের ঐকান্তিকতা সহকারে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া (আউযুবিল্লাহ পাঠ করা) ওয়াজিব অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য।

কেবল কুরআন পাঠের পূর্বে আউযুবিল্লাহর প্রতি তাকিদ হলো কেন ?

আমরা অনেক ধরনের ইবাদাত এবং বহু ভালো কাজ করে থাকি, কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়ার হুকুম হলো না বা ওয়াজিব হলো না, হলো কুরআন পাঠের পূর্বে। অথচ ছোট বেলা থেকে আমরা জানি বা এটা বহুল প্রচারিত কথা যে, কুরআন পাঠ করলে শয়তান ভাগে। মানুষ যখন কোনো শয়তান বা দুষ্ট জিনের ভয় অনুভব করে তখন এ ভয় দূর হওয়ার জন্য কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে। মনে করে এতে জিন, ভূত, শয়তান, যাই হউক ভেগে যাবে। কিন্তু কুরআন পাঠের পূর্বে আউযুবিল্লাহ্ পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য হওয়ার কারণে এটা সহজে বুঝে আসে যে, মানুষ যখন কুরআন পাঠ করে তখন শয়তান তার কাছে আসে, তার দিকে ধাবিত হয় বা তাকে আক্রমণ করে। আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার হুকুম থেকেই এটা পরিষ্কার বুঝা যায়। সাধারণত মানুষ যখন কোনো দুর্বৃত্ত বা কোনো শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয় তখনই কারো নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। ডাকাতে আক্রমণ করলে পুলিশের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। কোনো শিশুকে কেউ আক্রমণ করলে সে দৌড়ে যেয়ে তার আব্বা আম্মার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। মুরগীর বাচ্চাকে যদি চিল বা

www.pathagar.com

বাজ পাখী আক্রমণ করে দৌড়ে গিয়ে তার মায়ের বুকের নিচে আশ্রয় নেয়। মোটকথা কুরআন পাঠের পূর্বে শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার আদেশের কারণেই এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, কুরআন পাঠের সময় শয়তান পাঠকের প্রতি দারুণভাবে আক্রমণ চালায়। শুধুমাত্র কুরআন পাঠের পূর্বে শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার আদেশ থেকে এটাও পরিষ্কার হয় যে, মানুষের সকল কাজ এবং সকল ইবাদাতের মধ্যে কুরআন পাঠ নিয়ে শয়তানের মাথা ব্যথা বেশী এবং এখানে বিজয়ী হতে পারলেই শয়তানের বিজয়। এখন মনে প্রশ্ন জাগে একমাত্র কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে শয়তানের এতো আক্রমণ কেন ?

কুরআন পাঠের সময় শয়তানের তীব্র আক্রমণ কেন ?

শুধু কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে শয়তানের তীব্র আক্রমণের কারণ বর্ণনা করতে গেলে প্রথমেই মানুষের সাথে শয়তানের দুশমনির গোড়ার কাহিনী আলোচনা করা ছাড়া পরিষ্কার ধারণা লাভ করা এবং সঠিক তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। শয়তানের ধারণা হলো মানুষের কারণেই তার বিপর্যয়। মানুষের জন্যই তার গলায় লা'নতের তওক পরেছে। মানুষের কারণেই সে আল্লাহর নিকট থেকে বিতাড়িত হয়েছে এবং মালউন বা অভিশপ্ত হিসেবে আল্লাহ শয়তানকে ঘোষণা দিয়েছেন। সুতরাং শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করাকেই তার মূল লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। শয়তানের এ প্রতিজ্ঞা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে উল্লেখ হয়েছে। এখানে ২/১টি উল্লেখ করা হলো ঃ

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

"সে বললো, (ইবলিস বললো) হে আমার প্রতিপালক! তুমি যে আমার সর্বনাশ করলে তার শপথ আমি পৃথিবীতে পাপকর্মকে মানুষের জন্য শোভন করে তুলবো এবং আমি তাদের সকলের সর্বনাশ সাধন করবো।"

–সূরা আল হিজর ঃ ৩৯

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

"ইবলিস বললো, আপনার ক্ষমতার শপথ আমি তাদের সকলেরই সর্বনাশ সাধন করবো।"–সূরা সা'দ ঃ ৮২

www.pathagar.com

আদমের বিরুদ্ধে ইবলিসের যুদ্ধ ঘোষণার ইতিহাস

আল্লাহ আদম সৃষ্টির প্রাক্কালে ফেরেশতাদেরকে বললেন ঃ

اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ط

"আমি পৃথিবীতে খলিফা সৃষ্টি করবো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৩০

একথা শুনে ফেরেশতারা বললেন ঃ

قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّیْٓ اَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ ○

"ফেরেশতারা বললেন, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন ? যে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে। আমরা তো আপনার তছবিহ পাঠ করছি, আপনার প্রশংসা করছি ও আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আল্লাহ বললেন ঃ আমি যা জানি তোমরা তা জান না।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ৩০

এখানে কয়েকটি কথা ব্যাখ্যা দাবী করে (১) আদম দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে রক্তপাত ঘটাবে এ আশংকা করার ফেরেশতাদের কারণ কি ? (২) ফেরেশতাগণ একথাই বা বললেন কেন যে, "আমরাই তো আপনার তছবিহ ও প্রশংসা করছি।" আল্লাহ তো একথা বলেননি যে, আমি মানুষকে আমার তছবিহ করার জন্য দুনিয়ায় পাঠিয়েছি। (৩) আল্লাহ ফেরেশতাদের কথার উত্তরে বললেন না যে, তোমাদের ধারণা ভুল, মানুষ এ রকম করবে না। বরং উত্তরে আল্লাহ বললেন আমি যা জানি তোমরা তা জান না। (এ তিনটি কথার ব্যাখ্যা পুস্তকের শেষাংশে দেয়া হলো পৃষ্ঠা নং ৪৫ দ্রষ্টব্য)। অতপর আল্লাহ আদম আ.-কে সৃষ্টি করলেন এবং তাকে যাবতীয় জিনিসের নাম ও জ্ঞান শিক্ষা দিলেন এবং সমস্ত ফেরেশতাদের সম্মেলন ডেকে ফেরেশতাদেরকে পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের নাম বলতে বললেন। উত্তরে ফেরেশতাগণ একথা বলে অপারগতা প্রকাশ করলেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি সমস্ত রকম অজানা ও অজ্ঞতা থেকে পবিত্র অর্থাৎ মুক্ত কিন্তু আমরাতো শুধু ততোটুকুই জানি যতোটুকু আপনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং সকল জিনিসের নাম আমরা কি করে বলবো—অতপর আল্লাহ আদম আ.-কে বললেন ঃ হে আদম! তুমি তাদেরকে সকল জিনিসের নাম বলে দাও। আদম আ. সকল জিনিসের নাম বলে দিলেন। তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, স্বর্গ ও মর্তের অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে আমি সব জানি এবং তোমরা যা প্রকাশ

www.pathagar.com

করো বা গোপন রাখ তাও আমি জানি। উপরোক্ত ঘটনার দ্বারা যখন এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে, আদম আ. জ্ঞানের দৃষ্টিতে সকল সৃষ্টির থেকে শ্রেষ্ঠ তখন আদম আ.-এর এ শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করার নমুনা স্বরূপ সকল ফেরেশতা এবং ইবলিসকে আল্লাহ হুকুম করলেন আদম আ.-কে সেজদা করার জন্য।

সকল ফেরেশতা সেজদা করলো কিন্তু ইবলিস সেজদা করলো না। এখানেও অনেকে প্রশ্ন করেন যে, আল্লাহতো ফেরেশতাদের শুধু সেজদার হুকুম দিলেন ইবলিসকে তো দেননি। ইবলিস আদম আ.-কে সেজদা না করার মাধ্যমে আল্লাহর হুকুম অমান্য করলো। তখন আল্লাহ ইবলিসের প্রতি শোকজ নোটিশ দিয়ে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ দিলেন এবং ন্যায় বিচারের দাবীও পূরণ করলেন। আল্লাহ বললেন, হে ইবলিস! তুই কেন আদমকে সেজদা করলি না, যখন আমিই তোকে সেজদা করার হুকুম দিলাম। এটা ছিল আল্লাহর হক বিচারের কারণেই ইবলিসের প্রতি কারণ দর্শানোর সুযোগ দান। ইবলিস ইচ্ছা করলে ভুলের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারতো, কিন্তু সে তা না করে উল্টো পথ অবলম্বন করলো। অর্থাৎ নিজের অন্যায়কেই কুযুক্তির অবতারণা করে সঠিক বলে চালাতে চেষ্টা করলো। সে বললো ঃ

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ج خَلَقْتَنِى مِنْ نَارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ○

"আমি আদম থেকে ভালো অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। আমাকে আগুন দ্বারা তৈরী করা হয়েছে আর আদমকে তৈরী করা হয়েছে মাটি দ্বারা।"

–সূরা আল আরাফ ঃ ১২

এ কুযুক্তি দ্বারা ইবলিস দু'টি বড় পাপ করেছে (১) সে শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার প্রদর্শন করেছে। (২) প্রকারান্তরে সে একথাই বলতে চেয়েছে যে, আদমকে সেজদা না করা তার অন্যায় হয়নি, বরং আল্লাহই এমন একটা হুকুম দিয়েছেন যেটা ঠিক নয়, যুক্তিসংগত নয় কারণ আগুনের তৈরী ইবলিসকে বলা হয়েছে মাটির তৈরী আদমকে সেজদা করার জন্য, এ অবাস্তব হুকুম কি করে মানা যায়। মোটকথা এতে ইবলিসের এ মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে যে, আদমকে সেজদা না করে সে কোনো অন্যায় করেনি। আসলেই কি ইবলিস অন্যায় করেনি ? করে থাকলে কি কি অন্যায় করেছে। (শেষ নোট দ্রঃ) অতপর আল্লাহ ইবলিসের এ অপরাধের দরুন তার ওপর লা'নতের তওক দিয়ে তাকে বের করে দিলেন তখন ইবলিস আল্লাহর নিকট বললো ঃ "আপনি যে আদমের জন্য আমার সর্বনাশ করলেন আদম কি আপনার কথামত চলবে ? উত্তরে আল্লাহ বললেন, যদি না চলে তবে তাকেও ক্ষমা করা হবে না। অতপর ইবলিস আল্লাহর নিকট কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দেয়ার জন্য দাবী

www.pathagar.com

করলো এবং যেখানে ইচ্ছা যাওয়ার ক্ষমতা চাইলো। আল্লাহ তাকে দুনিয়ার সর্বত্র যাওয়ার ক্ষমতা দিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দিলেন। তখন ইবলিস বললো যে, সে আদমকে পথভ্রষ্ট করবে এবং আল্লাহর পথে চলতে দিবে না। আল্লাহ বললেন, আমার বান্দার প্রতি তোমার কোনো শক্তি খাটবে না। অর্থাৎ জোর করে তুমি বান্দাকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যাবে এ ক্ষমতা তোমাকে দিলাম না তুমি শুধু কুমন্ত্রণা দিতে পারবে। আমার কোনো বান্দা যদি স্বেচ্ছায় তোমার কথা শুনতে চায় এবং তোমার কথা মতো চলতে চায় তাকেই কেবল তুমি পথভ্রষ্ট করতে পারবে। আর যে বান্দা আমার দেয়া হেদায়াত বাদ দিয়ে তোমার কথা মতো চলবে তাদের দিয়ে এবং তোমাকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবো। আল্লাহ এবং ইবলিসের কথোপকথন কুরআনের অনেক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। নুমনা স্বরূপ ২/১টি উদ্ধৃত করা হলো।

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ۝ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

"ইবলিস বললো, আপনার ইজ্জতের শপথ, আমি তাদের সকলেরই সর্বনাশ সাধন করবো, তবে তাদের মধ্যে আপনার বিশুদ্ধচিত্ত দাসগণকে নয়। আল্লাহ বললেন ঃ আমিই সত্য, আমি যা বলি সত্য, তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবোই।"

–সূরা আস সাদ ঃ ৮২-৮৫

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ط وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا ط لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ - الاعراف : ١٦-١٨

"ইবলিস বললো, তুমি আমার সর্বনাশ করলে, এ জন্য আমিও তোমার সরল পথে নিশ্চয়ই ওৎ পেতে থাকবো। অতপর আমি মানুষের নিকট আসবোই তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বামদিক হতে এবং তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না। আল্লাহ বললেন এখান হতে বিকৃত অবস্থায় বের হয়ে যাও। যারা তোমার অনুসরণ করবে নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৬-১৮

www.pathagar.com

অতপর আল্লাহ আদম আ.-কে এবং তার স্ত্রী মা হাওয়াকে জান্নাতে থাকার অনুমতি দিয়ে বললেন, যা ইচ্ছে খাও, যেখানে ইচ্ছে যাও, কিন্তু এ বৃক্ষটির ধারে-কাছেও যেও না, যদি যাও তবে যালেমদের মধ্যে গণ্য হবে। যথারীতি হযরত আদম আ. ও মা হাওয়া জান্নাতে বসবাস শুরু করলেন। ইবলিস শুরু করলো তার ধোঁকার মিশন। ইবলিসের চিন্তা হলো আদমকে কিভাবে পদচ্যুত তথা জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করা যায়। কিভাবে আদমের দ্বারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করানো যায়। একটি মাত্র পথেই আদমের দ্বারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করানো সম্ভব তাহলো আদমকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের স্বাদ গ্রহণ করানো। এ নিষিদ্ধ বৃক্ষের নাম 'গন্দম' গাছ বলেই ব্যাপক প্রচার আছে, অবশ্য কুরআনে গাছের কোনো নাম উল্লেখ করা হয়নি। যাই হোক একদিন ইবলিস আদম আ. ও মা হাওয়াকে ধোঁকা দিয়ে নিষিদ্ধ বৃক্ষের স্বাদ আস্বাদন করালো। সে বললো শোন আদম, আমি কি তোমাকে অনন্ত জীবন বৃক্ষের সন্ধান দিব ? তুমি কি জান কেন তোমাকে সেই বৃক্ষের ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে ? কারণ এ বৃক্ষের স্বাদ আস্বাদন করলে তুমি ফেরেশতা হয়ে যাবে, জান্নাত তোমার জন্য চিরস্থায়ী হবে, তোমার মরণ হবে না, তুমি হবে অমর। সে কসম করে বললো ঃ "আমি তোমার একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী, তাই তোমাকে একথাগুলো বললাম।" মোটকথা ইবলিসের ধোঁকা এতো চাতুর্যপূর্ণ ছিল যে, সাময়িকভাবে আদম আ. তার কথায় পড়ে নিষিদ্ধ বৃক্ষ বা ফলের স্বাদ গ্রহণ করলেন। উল্লিখিত ঘটনা কুরআনে নিম্নরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অনেকে বলে মা হাওয়ার কারণেই আদম আ. নিষিদ্ধ বৃক্ষের স্বাদ গ্রহণ করেন—একথা কুরআন স্বীকার করে না।

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَانَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ○ وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ○ ـ الاعراف : ٢٠ـ٢١

"অতপর শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করলো, যেন তাদের লজ্জাস্থানসমূহ যা পরস্পরের নিকট গোপনীয় করা হয়েছিল, তা তাদের সম্মুখে খুলে দেয়, সে তাদেরকে বললো ঃ তোমাদের রব যে এ গাছের নিকট যেতে নিষেধ করেছেন। তার কারণ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে। কিংবা তোমরা অমর হয়ে যাবে। সে কসম করে বললো ঃ আমি তোমাদের সত্যিকার কল্যাণকামী।"

–সূরা আল আরাফ ঃ ২০-২১

www.pathagar.com

এভাবে যখন আদম আ. ও মা হাওয়া আল্লাহর হুকুম লংঘন করলেন, তখন সাথে সাথেই তাদের দেহ থেকে জান্নাতের পোশাক চলে গেল এবং উভয়ের নিকট পরস্পরের লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে গেল। আদম আ. চোখের পানি ছেড়ে জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে লজ্জা স্থান ঢাকতে শুরু করলেন। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আদম আ.-কে শোকজ (কল) করলেন অর্থাৎ কারণ দর্শাতে বললেন। বিচারের ভাষায় ঃ আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দিলেন। যেমনটি আল্লাহ ইবলিসকেও দিয়েছিলেন। আল্লাহ উভয়কে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে ঐ বৃক্ষের নিকট যেতে নিষেধ করিনি ? আমি কি তোমাদের বলিনি যে, ইবলিস তোমাদের উভয়ের শত্রু।

وَنَادٰهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَا اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ○

"তখন তাদের রব তাদের ডেকে বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষের নিকট যেতে নিষেধ করিনি। আর বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"–সূরা আল আরাফ ঃ ২২

আল্লাহ একই ধরনের কথা যখন ইবলিসকে বলেছিলেন তখন ইবলিস ভুল স্বীকার করেইনি। বরং নিজের অপরাধকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ সে যা করেছে ঠিকই করেছে একথাই সে বুঝাবার চেষ্টা করেছে। যার ফলে গাফুরুর রাহিম মহান আল্লাহর ক্ষমা লাভ থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে। ঔদ্ধত্য ও অহংকার প্রকাশ করার কারণে আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়েছে। কিন্তু আদম আ. এবং মা হাওয়া ইবলিসের মতো ছাফাই দেয়ার চেষ্টা করেননি। অন্যকথায় বাঁকা পথে কথা বললে তারাও বলতে পারতেন, কিন্তু তারা শয়তানী ব্যাখ্যায় না যেয়ে রূহানী পন্থা অবলম্বন করেছেন।

আদম আ. স্বীয় অপরাধ ঢাকার জন্য কি যুক্তি দিতে পারতেন

বর্তমান যুগে বহুলোক আদম আ.-এর এ ঘটনাকে নিয়ে অনেক রকম কুযুক্তির অবতারণা করে থাকে, যে কারণে সাধারণ লোক বিভ্রান্ত হয়। তারা বলে সবই আল্লাহর খেলা, আদমকে জান্নাতে দিলেন আবার ইবলিসকেও সেখানে যাওয়ার সুযোগ দিলেন। আল্লাহ তো ইচ্ছা করলে ইবলিসকে জান্নাতে না যেতে দিয়েও পারতেন। আবার অনেকে বলে সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়, আল্লাহর হুকুম ছাড়া গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ে না। তারা গানও রচনা করেছে, "যদি সবকিছু হয় খোদার হুকুমে আদমে গন্দম খেল কার হুকুমে।"

www.pathagar.com

আরও বলে—মানুষ হলো পুতুল, মানুষের করার কিছুই নেই। কারণ সবইতো আল্লাহর হুকুমে হয় সুতরাং "পুতুল যেমনি নাচাও তেমনি নাচি পুতুলের কি দোষ।" এরা আল্লাহকে লক্ষ্য করে বলে, "তুমি যদি সবার মূল আমি তো বাতুল, পাপ-পুণ্য যতোকিছু সবই তোমার পরে মাওলা সবই তোমার পরে।" একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় এ কুযুক্তিগুলোর উদ্ভাবক স্বয়ং ইবলিস। এসব কুযুক্তির দ্বারা সে মানুষের মনে এটাই বদ্ধমূল করতে চায় যে, মানুষের দ্বারা কিছুই হয় না সবই আল্লাহর দ্বারা হয়, সুতরাং মানুষের পাপের ভয় করার দরকার নেই। যাই হোক, হযরত আদম আ. ইচ্ছা করলে আল্লাহর প্রশ্নের উত্তরে বলতে পারতেন যে, "নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল গ্রহণ করার জন্য দোষ তো আল্লাহ তোমারই। কারণ তুমিইতো ইবলিসকে সর্বত্র যাওয়ার সুযোগ দিয়েছো, অন্যথায় যদি ইবলিস জান্নাতে না আসতো এবং কসম করে ঐসব কথা না বলতো তাহলে কি আমি গাছের নিকট যেতাম ? সুতরাং ইবলিস মিথ্যা ধোঁকা দিতে পেরেছে বলে-ই আমি ভুল পথে গিয়েছি। আর তুমি ইবলিসকে জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছ বলে সে আমাকে ধোঁকা দিতে পেরেছে। যেহেতু তোমার কারণেই ইবলিস জান্নাতে যেতে পেরেছে এবং যেতে পেরেছে বলেই ধোঁকা দিয়েছে, ধোঁকা দিয়েছে বলে আমি নিষিদ্ধ ফল খেয়েছি, কাজেই মূল দোষ আল্লাহ তোমারই, আমাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে লাভ কি ? হযরত আদম আ. ইচ্ছা করলে একথা বলতে পারতেন। কিন্তু বিচারের (অর্থাৎ ইনসাফের) দৃষ্টিতে এ যুক্তি টিকতে পারে না, কারণ এটা আসলেই কোনো যুক্তি নয় এটা কুযুক্তি। উল্টো চিন্তা করলে এগুলোকে যুক্তি বলে মনে হতে পারে এ ধরনের উল্টো যুক্তির অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন সিফ্ফিনের যুদ্ধে মশহুর সাহাবী হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার রা. হযরত মা'বিয়া রা.-এর সৈন্য বাহিনীর হাতে শহীদ হলেন। রাসূলুল্লাহ সা. এক হাদীসে বলেছেন যে, হযরত আম্মার রা. বিদ্রোহী বাহিনীর হাতে শহীদ হবেন। যখন হযরত আম্মার রা. শহীদ হলেন, তখন হযরত আলী রা.-এর পক্ষ থেকে বলা হলো যেহেতু আম্মার রা. হযরত মা'বিয়ার সৈন্যের হাতে শহীদ হয়েছেন সুতরাং ঐ বাহিনীই বিদ্রোহী। অপর দিকে ঐ বাহিনীর তরফ থেকে বলা হলো, হযরত আলী রা. তাকে যুদ্ধে এনেছেন বলেই তিনি শহীদ হয়েছেন। কাজেই হযরত আলী রা.-ই হযরত আম্মারের শাহাদাতের জন্য দায়ী। অতএব হযরত আলীর বাহিনীই বিদ্রোহী বাহিনী। যা হোক হযরত আদম আ. উল্টো যুক্তির পথে গেলেন না। তিনি বিষয়টি সঠিক ব্যাখ্যা করলেন এবং যথাযথ পথ অবলম্বন করলেন। তিনি নিজের ভুলকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করেননি। তিনি ভুলের স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলেন।

www.pathagar.com

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا سكته وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○ - الاعراف : ٢٣

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছি। এখন আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং রহম না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো।"–সূরা আল আরাফ ঃ ২৩

অতপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আদম আ.-কে শুধু ক্ষমাই করলেন না, সাথে সাথে তাকে নবুওয়াত দান করলেন এবং বললেন, তোমরা এখান থেকে পৃথিবীতে চলে যাও, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে পৃথিবীতে থাকতে হবে। সেই সাথে ইবলিসও তোমাদের শত্রু হিসেবে দুনিয়ায় যাবে। ইবলিসের দুনিয়ায় যাওয়ার কথা শুনে হযরত আদম আ. চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এজন্য যে দুনিয়ায়ও ইবলিস তার সাথে যাবে। যাবেতো বটেই তদুপরি স্বয়ং আল্লাহ এও বলে দিলেন যে, আদম এবং ইবলিস পরস্পর দুশমন হিসেবে যাবে। কথাটি শুনতে খুব ছোট এবং সহজ ঃ "তোমরা পরস্পর দুশমন।" কিন্তু আদম আ. অবশ্যই ভীত এবং চিন্তিত না হয়ে পারলেন না। কি করে পারবেন, তিনি তো স্বয়ং টের পেয়েছেন ইবলিস কি সাংঘাতিক ধরনের মিথ্যার জাল সৃষ্টি করে ধোঁকা দেয়। কখনো সে দীনের বিরোধী কথা বলে ধোঁকা দেয় না, দীনের কথা বলেই সে ধোঁকা দেয়। সে ফেরেশতা হওয়ার কথা বলে, জান্নাত পাওয়ার কথা বলে, অমর হওয়ার কথা বলে ইত্যাদি। তাই এ মারাত্মক শয়তানের কথা শুনেই আদম আ.-এর মনে স্বাভাবিক দুশ্চিন্তা। আল্লাহ আলিমুল গায়েব টের পেলেন আদমের মনের দুশ্চিন্তা। তখন তিনি আদমকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, যাও আদম, দুনিয়ায় যাও কোনো চিন্তা নেই ঃ

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ - البقرة : ٣٨

"অতপর আমার নিকট হতে জীবনবিধান তোমাদের নিকট পৌঁছে যাবে যারা সেই বিধান অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নেই তাদের চিন্তিত হওয়ারও কোনো কারণ নেই।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৩৮

একথা শুনে ইবলিস বুঝতে পারলো যে, তার বিরুদ্ধে আদম বংশের আসল অস্ত্র হলো আল্লাহর কিতাব বা বিধান। সুতরাং আল্লাহর বিধান থেকে মানুষকে বঞ্চিত রাখার মধ্যেই তার সফলতা। তাই যুগে যুগে ইবলিস মন্ত্রণা দিয়ে

www.pathagar.com

মানুষকে কিতাব থেকে দূরে সরিয়েছে, এমনকি এ মানুষের মাধ্যমেই সে আল্লাহর কিতাবকে বিকৃত করেছে। কিতাবের রূপ, ভাষা সবই বদলিয়ে দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ আজ খৃস্টানজগত যে বাইবেল প্রচার করে এটাকি হযরত ঈসা আ.-এর নিকট নাযিলকৃত সেই মূল ইঞ্জিল ? কখনই হতে পারে না। কারণ ইঞ্জিল নাযিল হয়েছে ইরামিক ভাষায়। অতপর তার অনুবাদ হয়েছে হিব্রু ভাষায়। আজ বিশ্বের সকল জাদুঘরে খুঁজলেও সেই মূল ইরামিক ভাষার একখানা বাইবেল পাওয়া যাবে না। এতে বুঝা যায় আসল ইঞ্জিলকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে পরবর্তীকালে ধর্ম যাজকগণ বাইবেল তৈরি করে নিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তার পূর্ণাঙ্গ বিধান হিসেবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.-এর ওপর নাযিল করলেন সর্বশেষ আসমানী কিতাব যার নাম—আল কুরআন, আল ফুরকান, হুদা ইত্যাদি। এ কিতাবের প্রথমেই সন্নিবেশ করা হলো ঃ "এটা সেই কিতাব যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। এটি মুত্তাকিদের জন্য জীবন বিধান।" এ কুরআনে আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিলেন, এ কিতাব কেউ ধ্বংস করতে পারবে না।

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ - الحجر : ٩

"নিশ্চয়ই এ কিতাব আমি নাযিল করেছি এবং এটা নিশ্চিত যে আমিই এ কিতাব সংরক্ষণ করবো।"–সূরা আল হিজর ঃ ৯

আউযুবিল্লাহর তাৎপর্য

শয়তান যখন একথা শুনলো যে, স্বয়ং আল্লাহ নিজে আল কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন, তখন এটাও তার নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন ধ্বংস করা সম্ভব নয়। অপর দিকে মানুষ যদি কুরআন অনুসরণ করতে থাকে তবে সেই মানুষকে কোনো মন্ত্রণা দিয়েই আর পরাজিত করা যাবে না। তখন স্বাভাবিকভাবেই ইবলিস কুরআন ধ্বংসের পণ্ডশ্রম করতে গেল না, তার মূল চেষ্টা হলো মানুষকে কুরআনের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা। কি করে কুরআন থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখা যায় এটাই শয়তানের বড় ফিকির। শয়তানের এটা বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় যে, মানুষকে কুরআন অমান্য করার হুকুম দিলে সেই মানুষ কখনো শুনবে না। বিশেষ করে যে লোক কুরআনের ওপর ঈমান এনেছে সে তো শুনতেই পারে না, তাই শয়তানের বড় চেষ্টা মানুষ যাতে কুরআন বুঝতে না পারে সেই ব্যবস্থা করা। আজ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কুরআনের যারা আহাল, সেই আহলে কুরআনগণই ইল্লাহ মাশায়াল্লা কুরআন বুঝেন না, এমনকি কুরআন শব্দের অর্থ কি তাও মুসলমান আজ জানে না। মুসলমানরাই আজ মনে ভাবে ঃ "আমরা সাধারণ মানুষ

www.pathagar.com

আমরা কি কুরআন বুঝতে পারবো ? অথচ একই সূরায় আল্লাহ চারবার বলেছেন ঃ সূরা আল কামার ঃ ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০ আয়াত।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۔ القمر : ١٧

"আমি এ কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করেছি কে আছে বুঝতে চায়।"

সাধারণভাবে একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, কুরআন আমাদের পক্ষে কখনও বুঝা অসম্ভব হতে পারে না। কারণ এ কুরআন আল্লাহ আমাদের জন্য পাঠ্য করেছেন অর্থাৎ আমাদের চলার পথের দিশা হিসেবেই আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন। আমরা অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর সাধারণ মানুষেরা যদি এ কুরআন বুঝবার যোগ্যই না হই, তবে কেন আল্লাহ তাদের জন্য এ কুরআন দিলেন, তার পক্ষে এটাতো কোনোই কঠিন ছিল না যে, তিনি এ যুগের মানুষের জন্য বোধগম্য কিতাব পাঠাতে পারতেন। অথচ তিনি কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য আল কুরআনকেই মনোনীত করেছেন। নিজেই বলেছেন একে তিনি সহজ করে দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে কোনো স্কুলে ক্লাস দশম শ্রেণীর ছাত্রের জন্য যে বই পাঠ্য করা হবে ক্লাস ওয়ান-এর ছেলের জন্য সেই বই পাঠ্য হতে পারে না। যদি কোনো হেড মাষ্টার ক্লাস ওয়ান এবং ক্লাস টেন-এর ছাত্রের জন্য একই বই পাঠ্য করেন তবে সকলেই ঐ হেড মাষ্টারকে পাগল বলবে। অতএব কুরআন যদি ক্লাস টেন-এর কিতাব হয়, আর এ যুগের মানুষরা যদি ওয়ানের ছাত্র হয়, তবে প্রকারান্তরে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহকে পাগল বলা হবে। যেহেতু তিনি এ যুগের জন্য কুরআনকে পাঠ্য করেছেন। বুঝা গেল বিষয়টি এমন নয় যে, কুরআন ক্লাস টেনের কিতাব, আর আমরা ওয়ানের ছাত্র, বরং এ কুরআন আল্লাহ আমাদের উপযুক্ত করেই প্রেরণ করেছেন। শয়তানের চক্রান্তে পড়েই আজকের মুসলমানরা মনে করছে যে, তারা কুরআন বুঝতে পারবে না। পূর্বের মনীষীগণ বুঝে গেছেন সুতরাং আর বুঝতে হবে না তাদের কথামত চললেই হবে। শয়তানের চক্রান্ত যে সবচেয়ে বেশী কুরআনের ব্যাপারেই হবে এটা আলিমুল গায়েব আল্লাহর জানা। তাই তিনি কুরআন অধ্যয়নকারীদের বলে দিলেন ঃ

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

"যখন তোমরা কুরআন তেলাওয়াত করো তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও।"

কথায় বলে, "সরষে দিয়ে ছাড়াবো ভূত সরষের মধ্যেই আছে ভূত।" যে আউযুবিল্লাহর মাধ্যমে মানুষ শয়তানের আক্রমণ থেকে মুক্ত হয়ে আল-

www.pathagar.com

কুরআনকে বুঝবে, শয়তানের চক্রান্তে পড়ে মানুষ সে আউযুবিল্লাহকেই একটা মন্ত্রের মতো ভেবে বসে আছে। মন্ত্র যেমন বুঝা লাগে না, শুধু পড়লেই চলে। আউযুবিল্লাহ যেন এমন যে, কোনো অনুভূতি ছাড়া, কোনো খেয়াল ব্যতিরেকে, মানুষ মন্ত্রের মতো পড়বে আর কুরআনের প্রতি তাদের দায়-দায়িত্ব পালিত হয়ে যাবে। শয়তানের আক্রমণ থেকে তারা আউযুবিল্লাহর বরকতেই বেঁচে যাবে। প্রকৃত ব্যাপার তা নয়, আউযুবিল্লাহ কোনো মন্ত্রের মতো জিনিস নয়। আউযুবিল্লাহ বুঝে পাঠ করা দরকার মনের মধ্যে এ ফিকির থাকা দরকার যে, কুরআন বুঝতে হবে অন্যথায় কুরআন থেকে হেদায়াত পাওয়া যাবে না। একথাও খেয়াল থাকতে হবে যে, শয়তান মানবজাতির দুশমন। কুরআন থেকে যাতে মানুষ পথের সন্ধান না পায় এটাই শয়তানের চেষ্টার মূল লক্ষ্য। একথা যদি খেয়াল থাকে, তবে মানুষ অবশ্যই চিন্তা করবে। প্রথমেই সে জানবে যে কুরআন কি ? কুরআন তার নিকট কি চায় ? সেই বা কুরআন থেকে কি পেতে চায় ? কুরআন না বুঝে পড়লে কি আসল লক্ষ্য হাসিল হবে ? মানুষ যখন বুঝেসুজে মনের উপলব্ধি নিয়ে আউযুবিল্লাহ পড়বে এবং শয়তানের বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার নিজস্ব চেষ্টা অব্যাহত রেখে শয়তানের থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে, সেটাই হবে প্রকৃত আউযুবিল্লাহ বা প্রকৃতপক্ষেই আশ্রয় চাওয়া। অন্যথায় মন্ত্রের মতো যে চাওয়া এর অবস্থা হলো ঐ ব্যক্তির মতো—যে নিজে তার জমিনে লাঙ্গল দেয় না, বীজও বোনে না, জমিন পতিত রেখে আল্লাহর নিকট এই বলে মোনাজাত করে ঃ আল্লাহ ! আমার জমিনে ভাল ধান দিও, ভাল ধান দিও। তার জমিনে ধান নয় শুধু আগাছাই জন্ম নেবে। আজ মুসলিম জাতির অসংখ্য লোকের অন্তর জমিনে কুরআনের শিক্ষার ফসল জন্ম না নিয়ে উল্টো কুরআন না বুঝার ইচ্ছা কেন জাগ্রত হচ্ছে, কেন তারা কুরআন বুঝতেই চায় না। গভীরভাবে আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে তা উদঘাটন করতে হবে।

বর্তমান মুসলিম সমাজে কুরআন তেলাওয়াতের অবস্থা

একথা সত্য যে আমাদের সমাজের সকল কুরআন পাঠকই জানে যে, পাঠের পূর্বে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাই তোয়ানির রাজিম' পড়া জরুরী, সকলেই পড়ে। কিন্তু তারপরও কি হচ্ছে ? ফল হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

(১) কুরআনের শব্দের অর্থও বুঝে না।

(২) কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝার চেষ্টা করে না, শুধু সওয়াবের জন্য তেলাওয়াত করে।

www.pathagar.com

(৩) কুরআন তেলাওয়াত করে তেলওয়াতের অর্থ ও তাৎপর্য কি তাও জানে না।

(৪) কুরআন বুঝার চেষ্টাকে ঈমানের জন্য ক্ষতিকর মনে করে।

উপরে যে ৪টি দুঃখজনক অবস্থা বর্ণনা করা হলো এর আসল কারণ হলো শয়তানের চক্রান্ত। এ চক্রান্ত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় পেতে হবে। অন্যথায় কুরআন থেকে হেদায়াত পাওয়া সম্ভব হবে না। আমার উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা এ ভুল বুঝার কোনো কারণ নেই যে, না বুঝে কুরআন তেলাওয়াত করলে কোনো সওয়াব হবে না। না বুঝে কুরআন তেলওয়াত করলেও সওয়াব হবে, সেটা নফল সওয়াব তার দ্বারা হেদায়াত লাভের জন্য যে ইল্‌ম হাসিল করা ফরয এ ফরয আদায় হবে না। বলা যেতে পারে সকলের জন্য সমান ইল্‌ম অর্জন করাতো ফরয নয়। কিন্তু তাই বলে যে মুসলমানের দাবীদার ব্যক্তি আরবী না জানলেও আরবীতে লিখিত চিঠি অন্য কারো কাছ থেকে পড়িয়ে বাংলায় বুঝে নেয় সে ব্যক্তির জন্য বাংলা ভাষায় ব্যাপক তাফসীর পাওয়া যাওয়ার পরও আল্লাহর লেখা এ চিঠিখানা পড়ে দেখার প্রয়োজন মনে হবে না, এটা বাস্তব নয়। মনে করুন, এক ব্যক্তির জামাই বিদেশে থাকে তার মেয়ে লেখাপড়া জানে না। বিদেশ থেকে জামাই মেয়ের নিকট পত্র দিয়েছে শ্বশুর সাহেব অর্থাৎ মেয়ের বাবা পত্র নিজে পড়লেন। পড়ে পত্রখানা রেখে দিয়ে মেয়েকে শুধু মোটা মোটা কয়টা খবর বলে দিলেন। বললেন জামাই যে টাকা পাঠিয়েছে সেটা এভাবে খরচ করতে বলেছে, তোমাকে নামায পড়তে বলেছে ইত্যাদি। এতেই কি মেয়ে যথেষ্ট মনে করবে ? না পিতার থেকে পত্রখানা চেয়ে নিয়ে অন্যকে দিয়ে তার প্রিয় স্বামীর মুখের ভাষা হুবহু পড়িয়ে শুনবে ? একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, পিতার ঐ সংক্ষিপ্ত খবরে মেয়ের মন ভরবে না। সে যদি পড়া নাও জানে তবু অন্যের দ্বারা পড়িয়ে সে তার স্বামীর জবানী অর্থাৎ সরাসরি স্বামীর কথা শুনবে। কারণ স্বামীর পত্র অন্যের মাধ্যমে পড়িয়ে শুনলেও সে অনেক কিছু বুঝতে পারবে এবং মনেও অনেক শান্তি অনুভব করবে। একটা সাধারণ মেয়ে যদি তার স্বামীর পত্র নিজ পিতার মাধ্যমে সংক্ষেপে শুনে শান্তি ও তৃপ্তি না পায়, তবে একজন ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহ প্রেরিত কালাম যেটা তার মালিক, তার প্রভু, তার প্রিয়তম আল্লাহ তার নিকট পাঠিয়েছেন সেটা হুবহু না পড়ে বা না বুঝে কিভাবে শান্তি লাভ করতে পারে ? বাস্তবে যে মুসলমানরা আল্লাহর কিতাব না পড়ে শান্তি ও স্বস্থিতে আছে এর মূল হলো শয়তানের চক্রান্ত। শয়তানের সৃষ্ট মিথ্যা এবং ভুল প্রচারণায় পড়েই মানুষ এমন বুঝ নিয়ে আছে। পূর্বে যে ৪টি অবস্থার কথা আমি বলেছি, অতপর ঐ চারটি কথার ব্যাখ্যা পেশ করবো।

www.pathagar.com

কুরআন শব্দের অর্থ

যে কয়টি জিনিসের প্রতি ঈমান না আনলে মুসলমান হওয়া যায় না, কিতাব (কুরআন) তার অন্যতম একটি। কুরআনের উপর বিশ্বাস না থাকলে ঈমানদার (অর্থাৎ মু'মিন) হওয়া যাবে না, মুসলিমও হওয়া সম্ভব হবে না। এ কুরআনের ওপর ঈমান আনার প্রকৃত অর্থ কি এই যে, একজন শুধু মুখে বলবে যে, কুরআন সত্য কিতাব, কুরআন আল্লাহর দেয়া কিতাব। এটাতো কুরআন সম্পর্কে সার্টিফিকেট দেয়ার সামিল। এমন সার্টিফিকেট অমুসলিম মনীষীগণও দিয়েছেন। ভাই গিরিশচন্দ্র তো একজন হিন্দু হয়েও এ সার্টিফিকেট শুধু নয়, কুরআনের বাংলা অনুবাদও করেছেন। তারপরও তিনি তো অমুসলিমই রয়ে গেছেন। তাহলে কুরআনের ওপর ঈমান আনার প্রকৃত তাৎপর্য কি ? এর উত্তর সন্ধান করতে গেলেই কুরআনের অর্থ বুঝা দরকার। কুরআনের কতকগুলো আল্লাহ প্রদত্ত নাম আছে (ক) কুরআন, (খ) হুদা, (গ) ফুরকান, (ঘ) জিকর, (ঙ) বাইয়্যেনাত ও (চ) নূর ইত্যাদি।

কুরআন ঃ কুরআন অর্থ পাঠ বা যা পড়তে হয়। এমন কোনো পাঠ আছে কি ? যা শুধু পড়লেই হয় ? মনোযোগ লাগে না, বুঝতে হয় না বা বুঝার জন্য পরিশ্রম করতে হয় না। আমরা জানি শিশুর জন্য যে পুস্তক পাঠ্য করা হয় সেই পুস্তকের একটা নাম থাকে। যে প্রবন্ধ বা কবিতা ছাত্রকে পাঠ্য হিসেবে দেয়া হয় তারও একটা নাম থাকে, এ নামের অর্থ ও তাৎপর্য থাকে এবং ছাত্রকে সেই অর্থ ও তাৎপর্য বুঝানো হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো আমরা 'কুরআন' শব্দের অর্থও বুঝি না বা বুঝার আগ্রহও রাখি না। আমি অনেক মাহফিলে সাধারণ শ্রোতাদেরকে জিজ্ঞেস করেছি "আচ্ছা বলুনতো, আমরা যে কুরআনের ওপর ঈমান না আনলে মুসলমান হতে পারি না, তার উপর ঈমান আনার অর্থ কি ? তার নামটিরই বা অর্থ কি ?" খুব কম লোকই হাত তুলতে পেরেছে বা মোটেই হাত তোলে নাই।

হুদা ঃ হুদা অর্থ ব্যবস্থাপত্র বা জীবনব্যবস্থা। কুরআনের পরিচয় দিতে গিয়ে স্বয়ং কুরআন ঘোষণা দিচ্ছে ঃ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ-

"এটা সেই কিতাব যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই।"-সূরা আল বাকারা ঃ২

হুদাললিল মুত্তাকিন এটা মুত্তাকিদের জন্য জীবনযাপন পদ্ধতি বা মুত্তাকিদের জন্য পথের দিশা অথবা মুত্তাকিদের জন্য জীবনযাপনের ব্যবস্থাপত্র। এ ব্যবস্থাপত্র কথাটার সাথে আমরা ইংরেজীতে বেশী পরিচিত। ডাক্তার রুগীদের রোগ নিরাময়ের জন্য যে উপদেশ দেন তার নাম

www.pathagar.com

Prescription-এর অর্থ ব্যবস্থাপত্র। এ ব্যবস্থাপত্র শুধু না বুঝে পাঠ করার জিনিস নয় বা ধুয়ে পানি পান করার জিনিসও নয়। Prescription -এ ডাক্তার যে ঔষধের কথা ও যে পথ্যের কথা লিখেছেন বুঝেসুঝে সে ঔষধ কিনে এনে খেতে হবে, যে পথ্য ডাক্তার খেতে বলেছেন সেই পথ্য খেতে হবে, যে জিনিস খেতে নিষেধ করেছেন তা খাওয়া বাদ দিতে হবে। হুদা অর্থ জীবনব্যবস্থা, এ ব্যবস্থাপত্রে মানুষকে আল্লাহ যা কিছু করতে বলেছেন তাই করতে হবে, যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এই হুদা বা কুরআনকে আল্লাহ নিজেই বলেছেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ

"এবং এ কুরআনে মু'মিনদের জন্য শেফা, রহমত নাযিল করা হয়েছে।"
–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮২

এ শেফা অর্থ মানুষের রূহানী শেফাই প্রধান। তবে কেউ যদি দৈহিক রোগের আরোগ্যও লাভ করেন সেটা অতিরিক্ত নিয়ামত।

ফুরকান ঃ ফুরকান শব্দের অর্থ হলো, মানদণ্ড বা কষ্টিপাথর। যার দ্বারা খাঁটি ও ভেজালের পার্থক্য করা হয়। এ কষ্টিপাথরের মাধ্যমে স্বর্ণ খরিদকারী বাছাই করে কোন্‌টা খাঁটি স্বর্ণ আর কোন্‌টা ভেজাল, কোন্‌টা গ্রহণ করা হবে, কোন্‌টা বাদ দেয়া হবে। কোনো এক ব্যক্তিকে তার মহাজন স্বর্ণ কিনতে পাঠালেন এবং সাথে একটি কষ্টিপাথর দিয়ে বললেন ঃ যাও, স্বর্ণ খরিদ করো। এ কষ্টিপাথর ব্যবহার করলে তোমার কোনো ঠক্ খাওয়ার ভয় নেই। এখন এ ব্যক্তিকে কি করতে হবে ? নিশ্চয়ই আমরা সকলেই স্বীকার করবো যে, এ ব্যক্তিকে প্রথমেই শিখতে হবে কষ্টিপাথর দিয়ে কি করে স্বর্ণ যাচাই করা হয়। এরপর যখনই তার সামনে কোনো সোনা খরিদ-এর প্রশ্ন আসবে সে এ কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিবে। অন্যথায় সোনার বদলে ঠগবাজ শয়তান তাকে পিতল বা ইমিটেসন দিয়ে বলবে, "নিন একেবারে খাঁটি ১নং সোনা। "ইমিটেসন বা পিতল" পালিশ দিলে খুবই চকচকে হয় কিন্তু সোনা হয় না। কথায় বলে All that Glitters is not gold—"চকচক করলেই সোনা হয় না।" এভাবে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যদি সেই ব্যক্তি কষ্টিপাথর পকেটে রেখে দেয় আর ঠগবাজের কথায় বিশ্বাস করে সোনার বদলে পিতল কিনে নিয়ে যায়, আর মহাজনের নিকটে গিয়ে বলে যে, "আমার কোনো দোষ নেই ঐ শয়তান বেটা আমাকে এভাবে ধোঁকা দিয়েছে।" একথায় মহাজন কি তাকে ছাড়বে ? অথবা যদি সে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে এ কারণে পিতলকে স্বর্ণ মনে করে কিনে নেয় যে, সে কষ্টিপাথর দিয়ে কিভাবে স্বর্ণ

www.pathagar.com

যাচাই করতে হয় সেটা বুঝেননি। তাহলেই কি সে মুক্তি পাবে ? অবশ্যই একথা স্বীকার করতে হবে যে, কোনো অবস্থায়ই মহাজন তাকে ছাড়বে না। প্রথম অবস্থা হলে মহাজন তাকে এই বলে ধরবে যে, পকেটে কষ্টিপাথর রেখে তুমি পিতলকে সোনা বলে গ্রহণ করেছো এটা তোমারই অপরাধ। অতএব এ নোকসানের বোঝা তোমাকেই বহন করতে হবে। আর যদি কষ্টিপাথর না বুঝার কারণে সে সোনা মনে করে পিতল গ্রহণ করে থাকে তবে তাকে ছাড়া হবে না। মালিক বলবে, তোমাকে তো বলেছিলাম যে, কষ্টিপাথরে কিভাবে ঘষতে হয় তা অবশ্যই শিখে নিবে, তুমি কেন শিখলে না। এ বিষয়ে ইমাম গাজ্জালী র. বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিল করলো কিন্তু সেই মতো কাজ করলো না, তার পাপ একটা। আর যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিল না করে, না জেনে আল্লাহর হুকুম অমান্য করলো তার পাপ দু'টো। একটা পাপ ইল্‌ম হাসিল না করার জন্য এবং দ্বিতীয়টা কাজ না করার কারণে। ইল্‌ম হাসিল করাও তার জন্য অবশ্য কর্তব্য বা ফরয ছিল। কুরআনকে ফুরকান অর্থাৎ কষ্টিপাথর হিসেবে দেয়ার কারণ এবং অর্থ আশা করি উপরের আলোচনায় পরিষ্কার হয়েছে। অতএব কুরআন হলো নকল থেকে বাঁচার জন্য কষ্টিপাথর।

জিকর ঃ জিকর শব্দের কয়েকটি অর্থ আছে, তার মধ্যে একটি হলো উপদেশ, আর একটি হলো বিধান বা স্মারক। এজন্য এ দুই অর্থে কুরআনেরও এক নাম 'জিকর'। মুসলমান এবং আহলে কিতাবদের বলা হয় আহলে 'জিকর'। বিধান শব্দের ব্যাখ্যা আমি সংক্ষেপে হুদা অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। এখানে উপদেশ সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা করবো। উপদেশ অর্থ আমাদের সকলের নিকটই পরিষ্কার। তাই এর অর্থ নিয়ে আলোচনার দরকার নেই। উপদেশের সাথে আচরণ কি হবে এটাই আলোচ্য। উপদেশ এমনই জিনিস যা বুঝলেই একমাত্র উপদেশ হয়, না বুঝলে উপকার না হয়ে হিতে বিপরিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। উপদেশ না বুঝে যদি মুখস্ত করে সারাদিন তেলাওয়াত করা হয় কোনো লাভ হবে না, কাজও হবে না। দুই বন্ধু ছিল একজনের নাম আঃ রহিম, অপরজন আঃ করিম। দু'জনের বন্ধুত্ব খুবই গভীর, এমন গভীর যেন দুই দেহ এক প্রাণ। একদিন আঃ করিম গিয়েছিল ওয়াজ শুনতে সেখানে বক্তা একটি শেখ সা'দী র.-এর ফারসি কবিতার দুই লাইন আবৃত্তি করে অর্থ বয়ান করলেন।

"দোস্তে আবাসাতকে গিরাত দাস্তে দোস্ত
দারপেরেশাঁ হালে ওদার মান্দেগী।"

অর্থাৎ সেই প্রকৃত দোস্ত যে দোস্তের বিপদের সময় তার হাত ধরে। এ লাইন দু'টির অর্থ শুনে আঃ করিমের খুব পছন্দ হলো, সে উপদেশ হিসেবে মনের

www.pathagar.com

মধ্যে গেঁথে রাখলো। তার দোস্তের বিপদের দিনে যেন হাত ধরতে পারে। একদা তার দোস্ত আঃ রহিমের সাথে এক ইহুদির হাতাহাতি শুরু হলো, দু'জনেই সমানে সমান। ইহুদী একটা দিলে আঃ রহিমও একটা দেয়। দূর থেকে আঃ করিম তার দোস্ত আঃ রহিমের সাথে ইহুদির মারামারি দেখতে পেল। সহসাই তার মনে পড়লো—দোস্তে আবাসাতকে গিরাত দাস্তে দোস্ত দারপেরেশাঁ হালে ওদার মান্দেগী।

সে ভাবলো সেই প্রকৃত বন্ধু যে তার বিপদের সময় হাত ধরে। আর কথা নেই অমনি সে দৌড়ে গিয়ে পেছন দিক থেকে আঃ রহিম-এর দুই হাত চেপে ধরলো। তার ধারণা হলো, শেখ সা'দীর কথা মিথ্যা হতে পারে না। সুতরাং শক্ত করেই বন্ধুর হাত দু'টি ধরে রাখলো। এদিকে সুযোগ পেয়ে ইহুদী এমনভাবে আঃ রহিমকে আঘাত করলো যে, তার অবস্থা মারাত্মক হলো। মারাত্মক আহত আঃ রহিম বিছানায় শুয়ে আঃ করিমকে বললো, দোস্ত এ তুমি কি করলে ? প্রথমে একটা দিচ্ছিলাম একটা খাচ্ছিলাম। সমানে সমান ছিলাম, কিন্তু তুমি হাত দু'টো ধরাতেই আমার এ দুরবস্থা হলো, এটা তুমি কেন করলে। উত্তরে আঃ করিম বললো, আমিতো শেখ সা'দীর উপদেশ মতো কাজ করেছি তাতে কেন এমন হলো। উল্লিখিত ঘটনায় কি বুঝা গেল ? আসলেই কি শেখ সা'দীর উপদেশটি ভুল ছিল ? অথবা আঃ করিম উপদেশটিকে বুঝতেই পারেনি। অথবা শব্দার্থকে আসল অর্থ ধরে নেয়ার কারণেই ভুল বুঝেছে। প্রকৃতপক্ষে শব্দার্থ দিয়ে অর্থ করলে অনেক ক্ষেত্রেই আসল অর্থ বুঝে আসে না, যেমন এখানে হাত ধরা মানে আঃ করিম ভুল করেছে। "সেই প্রকৃত বন্ধু যে বিপদের দিনে বন্ধুর হাত ধরে থাকে", হাত ধরার অর্থ হাত ধরা মনে করেছে। এখানে হাত ধরা অর্থ বিপদে সাথী হওয়া। মারামারির সময় হাত ধরার অর্থ বন্ধুকে মারামারি থেকে মুক্ত করা অথবা বন্ধুর সাথী হয়ে শত্রুর মোকাবেলা করা। এ ঘটনায় এটা পরিষ্কার হলো যে, উপদেশ না বুঝলে হিতে বিপরীত হওয়াই অবধারিত।

বাইয়্যেনাত ঃ বাইয়্যেনাত অর্থ সুস্পষ্ট। কুরআন মজীদের অনেক আয়াতেই আল্লাহ বলেছেন ঃ হেদায়াতের ব্যাপারে কুরআন হলো বাইয়্যেনাত অর্থাৎ এর মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। জাহিরে, বাতুনে বলে কিছু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য খাস রাখা হয়েছে এ ধরনের ধারণা এখানে অমূলক। কেউ কেউ বলে থাকেন নব্বই হাজার কালাম, ত্রিশ হাজার মাত্র জাহিরে আর ষাট হাজার বাতুনে। এ বাতুনেরটা কাগজের কুরআনের মধ্যে পাওয়া যাবে না। এটা হলো দিলের ভিতরে। তারা শয়তানের চক্রান্তে পড়ে এ রকম গানও রচনা করেছে "কুরআন ভাইরে ভরা রসে কি হবে তার কাগজ চুষে এবার দিল কুরআনের তত্ত্ব

www.pathagar.com

লও বুঝিয়া মুন্সি মিয়া কুরআনটি পড় কার লাগিয়া তারে পাইছনি কেউ কুরআনে খুজিয়া।" এরা বলতে চায় যে ঐ ষাট হাজার কালাম সিনায় সিনায় এসেছে সুতরাং অধ্যয়নের মাধ্যমে একে বুঝা যাবে না, এর মর্মও পাওয়া যাবে না। এটাও শয়তানের একটা ধোঁকা। কুরআন থেকে মানুষের দৃষ্টি এবং মনকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়াই হলো এর উদ্দেশ্য। উদাহরণ স্বরূপ একটা ঘটনা বলি, যেটা আমার নিজের সাথে হয়েছে। একজন ভদ্র লোক গ্রাজুয়েট, ব্যাংকে চাকরি করেন তার এ সিনায় সিনায় ইল্‌মের ওপরে বিশ্বাস। একদিন তিনি কোনো এক পুস্তকে রসূল সা.-এর ওপর প্রথম অহী নাযিলের ঘটনা পড়ে দেখতে পেলেন তাতে লেখা আছে জিবরাঈল আ. এসে রসূল সা.-কে বললেন পড় ! তিনি বললেন ঃ "আমি পড়তে জানি না, তখন জিবরাঈল তাকে জড়িয়ে ধরলেন, পুনরায় ছেড়ে দিলেন। এভাবে তিনবার জড়িয়ে ধরলেন এবং ছেড়ে দিলেন। অতপর রসূল সা. পড়লেন। এ ঘটনা পড়ে ভদ্র লোক আমাকে এসে বললেন, সিনায় সিনায় ইল্‌ম বিশ্বাস করেন না, এবার দেখেন সত্য কিনা। উত্তরে আমি তাকে বললাম, রসূল সা.-কে জিবরাঈল আ. জড়িয়ে ধরার কারণে যদি আপনি বলতে চান যে, সিনায় সিনায় ইল্‌ম হবে তাহলে বলুন, রসূল সা. সিনায় সিনায় কোনো সাহাবীকে ইল্‌ম দিয়েছেন, এমন কোনো হাদীস আছে কি না ? কোনো হাদীস তিনি পেশ করতে পারলেন না। কিন্তু তার দাবী থেকেও পিছু হটলেন না, তখন তাকে বললাম আচ্ছা! যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেই যে, জিবরাঈল আ. রসূল সা.-কে সিনায় সিনায় ইল্‌ম দিয়েছিলেন। তাহলে সিনায় ইল্‌ম দেয়ার ফর্মূলা হলো (১) একটি লাগবে মানুষের সিনা আর অপরটি হতে হবে ফেরেশতার সিনা, (২) মানুষের সিনাটি হতে হবে চাক করা, ধোয়া সিনা কারণ রসূল সা.-এর সিনা চাক করা হয়েছিল এবং ধোয়া হয়েছিল। এখন বলুন আপনার পীর সাহেব কোন্ ফেরেশতার সাথে সিনা লাগিয়েছেন এবং কোন্ মেডিকেল হাসপাতাল থেকে তার সিনা চাক করে ধুয়ে আনা হয়েছে ? যাই হোক একথার পর ভদ্রলোক সত্যের সামনে চুপ হয়ে গিয়ে শুধু বললেন, "আপনার সাথে যুক্তিতে পারা মুস্কিল।" কাজেই প্রমাণ হলো যে, আল কুরআন সুস্পষ্ট আলোকে উদ্ভাসিত। এখানে জাহিরে বাতুনের কথা বলে নানা রকম ধূম্রজাল সৃষ্টি করার আসল ওস্তাদ হলো শয়তান।

নূর ঃ নূর অর্থ আলো অর্থাৎ লাইট। মানুষ যখন অন্ধকার রাস্তায় চলে তখন রাস্তা যাতে স্পষ্ট দেখা যায় এজন্য লাইট ব্যবহার করে। লাইট জ্বালিয়ে ঘরের অন্ধকার দূর করে, অপরদিকে অজ্ঞানতা হলো অন্ধকার। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—অজুর দোয়ার মধ্যে আমরা পড়ি "আল ইসলামু নুরুন ওয়াল কুফরু জুলুমাত।" ইসলাম হলো আলো আর ইসলামকে বাদ দেয়া বা স্বীকার না করা হলো "কুফরী" মানে অন্ধকার। এখন চিন্তা করা যাক ঃ রাস্তা দেখার

www.pathagar.com

জন্য যে লাইট সে লাইট যদি পকেটেই রাখা হয়, হাতে নিয়ে পথ দেখার লক্ষ্যে যদি সুইস টিপা না হয়, তাহলে এ লাইটে কি কাজ হবে ? কথায় বলে সাথে যদি টর্চ লাইট থাকে তাহলে অন্ধকার রাতে চলতে কোনো অসুবিধা নেই। একথার অর্থ যদি কেউ এভাবে করে যে, যেহেতু শুধু বলা হয়েছে যে, সাথে যদি টর্চ লাইট থাকে তবে অন্ধকারে পথ চলতে অসুবিধা নেই। এর অর্থ ঃ ব্যাগের টর্চ বেরও করা হবে না, সুইসও টিপা হবে না, ব্যাগের ভিতর থেকেই আলো দিতে থাকবে, কারণ লাইট থাকার কথা বলা হয়েছে, লাইট হাতে নেয়া বা সুইস টিপার কথাতো বলা হয়নি। তবে এমন ব্যক্তিকে লোকে কি বলবে ? আর ঐ লাইট থাকারও কি কোনো স্বার্থকতা থাকবে ?

আমার উপরোক্ত বিশ্লেষণের পর এখন চিন্তা করুন, এই যে কুরআনের ছয়টি নামের ব্যাখ্যা করা হলো, এ নামগুলো থাকা সত্ত্বেও মানুষ কেন মনে করে যে, কুরআন শুধু না বুঝে তেলাওয়াতেই কাজ হবে। অতএব কুরআনের নামগুলোই প্রমাণ করে যে, কুরআন বুঝা একান্ত অপরিহার্য, অন্যথায় কুরআনের ওপর ঈমান আনার কোনো অর্থ হয় না। কুরআনের ওপর ঈমান আনা মানে এ নয় যে, কুরআন সত্য, কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত একথার সার্টিফিকেট দিতে হবে। বরং কুরআনের ওপর প্রকৃত ঈমান হলো এই যে, (১) কুরআন হলো পাঠ, সুতরাং না বুঝে পাঠ হয় না। (২) কুরআন হলো জীবনযাপনের পদ্ধতি, না বুঝলে ঐ পদ্ধতি ব্যবহার করা কখনো সম্ভব নয়। (৩) কুরআন হলো কষ্টিপাথর, সুতরাং কষ্টিপাথর ব্যবহার পদ্ধতি না জানলে এবং এ কষ্টিপাথর ব্যবহার না করলে কষ্টিপাথর থাকায় বা রাখায় কোনো ফায়দা নেই। (৪) কুরআন হলো উপদেশ, উপদেশ না বুঝলে উল্টো ফল হয়। (৫) কুরআন হলো বাইয়্যেনাত বা সুস্পষ্ট। সুতরাং তাকে অস্পষ্ট, কঠিন, মারেফাত, বাতুন বা জাহের বলে ধুম্রজাল সৃষ্টি করে লাভ নেই। (৬) কুরআন হলো আলো, অতএব লাইট ব্যবহার না করে সুইস না টিপে রাস্তা দেখা সম্ভব নয়।

কুরআনের মর্ম বুঝার চেষ্টা না করে শুধু সওয়াবের জন্য পড়ে

বর্তমানে লক্ষ লক্ষ মুসলমান কুরআন না বুঝে বেশী বেশী তেলাওয়াত করে, কিন্তু বাংলায় অনেক তাফসীর ও তরজমা থাকার পরও তারা তাফসীর ও তরজমা পড়ার কোনো প্রয়োজন অনুভব করেন না। এর কারণ হলো কুরআন নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য এবং কুরআনের ওপর ঈমান আনার তাৎপর্য তাদের নিকট পরিষ্কার নয়। তাদের ধারণা কুরআন তেলাওয়াত করলে সওয়াব হয়। সুতরাং সওয়াবের আশায় তারা যথেষ্ট ভক্তি ভরেই কুরআন বারবার তেলাওয়াত করে। কুরআন তেলাওয়াতের ফরযিয়াত এবং সওয়াব এর মূল

www.pathagar.com

পার্থক্য পরিষ্কার না থাকার কারণেই জাতির এ অবস্থা। হাদীস শরীফে আছে, কুরআন তেলাওয়াত করলে প্রতিটি অক্ষরে দশ দশ নেকি হয়। এ হাদীস শুনে লোকেরা মনে করে বার বার আরবী তেলাওয়াত করলে প্রতি অক্ষরে দশটা করে নেকি হবে, বাংলা পড়লে বাংলা প্রতি অক্ষরে দশ নেকি হবে না। নেকি বা সওয়াবের পরিষ্কার জ্ঞানই আমাদেরকে এ অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে। প্রশ্ন হলো কতগুলো সওয়াব হলে একজন মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে। আখেরাতে এ সওয়াবগুলোর মূল্যায়ন কিভাবে হবে। মানুষ প্রতিনিয়ত এই যে শত সহস্র সওয়াব কামাই করে, এগুলো সবই কি শুধু বাড়তে থাকে ? না এ সওয়াব নষ্ট হওয়ারও কোনো ব্যাপার আছে, অবশ্যই নষ্ট হওয়ার ব্যাপার আছে। উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন—একজন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য দু-ধরনের কাজ করতে হয়। একটা ইতিবাচক অন্যটা হলো নেতিবাচক। অর্থাৎ একটা হলো মানুষকে করতে হয়, অপরটি হলো যার থেকে মানুষকে বিরত থাকতে হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতেও মানুষের ঈমান রূপ জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যও অনুরূপ দু-ধরনের কাজ করতে হয়—একটি ইতিবাচক অপরটি নেতিবাচক অর্থাৎ একটা হলো মানুষকে করতে হয়, অপরটি যার থেকে মানুষকে বিরত থাকতে হয়। শরীয়তের ভাষায় একে বলা হয় ফারায়েয এবং কাবায়ের। এক বচনে বলা হয় ফরয এবং গুনাহ কবীরা। মানব দেহের জন্যও কতক কাজ ফরয যা না হলে তার জীবন বাঁচে না, স্বাস্থ্য ভালো থাকে না, সুস্থ্যতা বৃদ্ধি হয় না। যেমন তার দেহের জন্য প্রয়োজন ভিটামিন, প্রোটিন, চিনি বা শর্করা, লবণ, লৌহ, চর্বি, পানি ইত্যাদি এসব প্রয়োজনীয় জিনিস যদি খাদ্যের মাধ্যমে মানুষ পরিমিত গ্রহণ করে তবে স্বাস্থ্য ঠিক থাকে, যদি কম পরিমাণে গ্রহণ করে স্বাস্থ্য আস্তে আস্তে দুর্বল হতে হতে মানব দেহ অচল হয়ে যায়। অপর দিকে কতকগুলো জিনিস একেবারে নিষিদ্ধ, কতকগুলো ক্ষতিকারক। ক্ষতিকারক জিনিস যদি মানুষ গ্রহণ করে তবে আস্তে আস্তে ধ্বংসের দিকে চলে যায়। আর একেবারে নিষিদ্ধ জিনিস যদি গ্রহণ করে একেবারেই শেষ হয়ে যায় যেমন এনড্রিন, যেকোনো রকমের বিষ, বেশী পরিমাণ আফিম ইত্যাদি। এগুলো যদি মানুষ গ্রহণ করে তাহলে তার জীবন শেষ হয়ে যায়। এ স্বাস্থ্যের জন্য কল্যাণকর যে সমস্ত জিনিস যেমন—দুধ, ঘি, ছানা, মাখন, গোশত, ফল ইত্যাদি যেগুলো ধনী মানুষ খেয়ে স্বাস্থ্য উন্নত করে। আর মোটা ভাত, লবণ ও মরিচ বাটা খেয়ে গরীব মানুষ কোনো রকমে জীবন বাঁচায়। বুঝার সুবিধার জন্য অবস্থা সম্পন্ন মানুষ উন্নত স্বাস্থ্য লাভ করার জন্য যেগুলো খায় সেগুলোকে আমরা যদি স্বাস্থ্যের জন্য নফল সওয়াব ধরি এবং যেগুলো না খেলে জীবন বাঁচে না সেগুলোকে

www.pathagar.com

স্বাস্থ্যের জন্য ফরয ধরি, আর মারাত্মক নিষিদ্ধ দ্রব্যকে হারাম বা কবিরা গুনাহ ধরি, তাহলে মনে করুন একটি লোক দশ বছর দুধ, মাছ, গোশত, ঘি, চিনি ইত্যাদি খাওয়ার মাধ্যমে প্রচুর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সওয়াব অর্জন করলো। দশ বছর পর একদিন কিছু এনড্রিন খেল, এখন কি হবে ? তার দশ বছরের হাজার হাজার ভিটামিন ও প্রোটিনের (সওয়াবের) কারণে কি সে বেঁচে থাকবে, না এক দিনের সামান্য এনড্রিনের কারণে জীবন যাবে ? নিশ্চয়ই আমরা বলতে বাধ্য যে, সামান্য এনড্রিন খাওয়ার ফলে তার জীবন যাবে। এতে এটা প্রমাণ হয়ে গেল দশ বছরের নফল সওয়াব সবই একদিনের এনড্রিনে ধ্বংস করে দিল। কাজেই আমি উল্লেখ করেছি যে, মানুষ কুরআন না বুঝে তেলাওয়াত করে লক্ষ লক্ষ নফল সওয়াব অর্জন করে খুশী হচ্ছে। অপর দিকে কুরআন না বুঝার কারণেই সে এমন কাজের দিকে ধাবিত হচ্ছে, যে কাজগুলো তার মহামূল্য ঈমানই নষ্ট করে দিতে পারে বা তাকে শয়তানের পথে নিয়ে যেতে পারে। ভুল ধারণার কারণে মানুষ ভাবছে যে, তাদের কুরআন বুঝা লাগবে না। যেহেতু বিজ্ঞজনেরা ও বুজর্গগণ কুরআন পড়ে তাদের করণীয় কি তা বলে দিয়েছেন। কি কি কাজ করলে নাযাত হবে তাও বলেছেন। এখানে প্রশ্ন জাগে যে, কুরআন কেন এসেছে এবং কুরআনে কি আছে ? কুরআন যে উদ্দেশ্যে এসেছে অন্য একজনে পড়ে সওয়ালা বলে দিলেই কি কুরআনের কাজ শেষ হলো এবং সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেল ? কখনই তা হতে পারে না। কারণ কুরআন হলো পথের দিশা, কুরআন হলো ফুরকান, যে কোনো সন্দেহ বা সমস্যা এ ফুরকান বা কষ্টিপাথরে যাচাই করে গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে, কুরআন না বুঝে একাজ কিভাবে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মানুষের মধ্যে ঈমান পয়দা হওয়ার জন্য স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, যে কথা শুনলে অন্তর বিগলিত হবে, কুরআন বুঝা ছাড়া একাজ মানুষের কথা বা লেখার মাধ্যমে কি করে হবে ? শয়তান মানুষকে মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে, ধোঁকা দিয়ে অন্য পথে নিয়ে যায়। কুরআন তার মোকাবেলায় এমন কথা পেশ করে যার মোকাবেলায় শয়তানের জারি-জুরি খতম হয়ে যায়। তাইতো শয়তানের সাথে মোকাবেলার ঔষধ হিসেবে আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ - البقرة : ٣٨

"যারা আমার এ কুরআনকে অনুসরণ করবে শয়তানের ভয়ে ভীত হওয়ার তাদের কোনো কারণ নেই।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৩৮

www.pathagar.com

আল্লাহ এখানে কোনো ব্যক্তিকে অনুসরণ করার কথা বলেননি, বলেছেন কুরআন অনুসরণের কথা। আরও একটি বড় ব্যাপার হলো মানুষ যার কথা বেশী বেশী শুনে ধীরে ধীরে তার ভক্ত হয়। এ জন্য বেশী বেশী আল্লাহর কথা শুনলে মানুষের মনে আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। কুরআন যেহেতু নির্ভেজাল আল্লাহর কথা, তাই কুরআন শুনলে মনের মধ্যে বেশী বেশী আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টি হয়। খৃষ্টান ও ইহুদী সমাজ আল্লাহর বাণীকে বাদ দিয়ে বেশী বেশী তাদের পীর-বুজর্গদের কথা শুনার ফলে তাদের হৃদয়ে বুজর্গ ভক্তিই সৃষ্টি হয়েছে। যার উল্লেখ আল্লাহ কুরআনে করেছেন ঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ التوبة : ٣١

"তারা তাদের আহবার এবং রুহবানদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়ে নিয়েছে।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৩১

বর্তমানেও দেখা যায় লোকেরা একদিকে নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয়, অপর দিকে বিভিন্ন মানুষকে আল্লাহর মর্যাদায় বসিয়ে নেয়। তাদেরকে আল্লাহ বলে না, কিন্তু বাবা বলে, মুরশিদ বলে, হুজুর কেবলা বলে, অলী, বুজর্গ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করলেও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর মর্যাদায়ই তাদের অভিসিক্ত করে। মোটকথা, কুরআন না বুঝলে মানুষের মনে কখনো সে অনুভূতি এবং সে অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে না, যে অবস্থা এবং যে অনুভূতি সৃষ্টি করার জন্য কুরআন এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একজন মহিলা নিজে লেখাপড়া জানে না, তার স্বামী এবং ছেলে বিদেশে থাকে। অনেক দিন তাদের কোনো পত্র পায় না, মনে তার দুশ্চিন্তা। হঠাৎ একদিন ডাক পিয়ন এসে মহিলার নিকট একখানা পত্র দিল, মহিলা ডাক পিয়নকে জিজ্ঞেস করলো, কে পত্র পাঠিয়েছে ? খামের ওপর প্রেরকের নাম লেখা ছিলো সেটা পড়ে পিয়ন নাম বললে পরে মহিলা জানলো তার স্বামীর পত্র এসেছে। পত্র না খুলেই মহিলার কি আনন্দ, তার স্বামী অনেক দিন পর পত্র দিয়েছে। এ পত্র পেয়ে তার আনন্দ ছাড়া আর কি হতে পারে, ভদ্র মহিলা রান্নাবান্না সেরে পাশের বাড়ীর খোকনকে গিয়ে মনের আনন্দে বললো, "বাবা আমার পত্রটা একটু পড়ে শুনাও।" পত্রখানা যখন খোলা হচ্ছে তখনও মহিলার কি আনন্দ যখন পত্রের মধ্যে শুনতে পেল তার ছেলে বিদেশে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গিয়েছে। সাথে সাথে মহিলার অবস্থা কি রকম হলো এটাকি ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন আছে ? একটু পূর্বে পত্রের কারণে যে ছিল এতো আনন্দিত। একটু পরেই তার এতো কান্নার কারণ কি ? কারণ হলো, একটু পূর্বে সে পত্রের অর্থ বুঝেনি এখন সে অর্থ বুঝেছে, যাতে এমন একটি খবর আছে যে খবর শুনে কেউ হাসে না সবাই কাঁদে। কিন্তু এ পত্রের মর্ম না বুঝলে কেউ কাঁদে না,

www.pathagar.com

হাসে না, কি করবে তাও জানে না, শেষে মন যা চায় তাই করে। কুরআন না বুঝলে অথবা কুরআনের অর্থ না শুনলে মনের সেই অবস্থা কোনোদিন আসবে না যে অবস্থা সৃষ্টির জন্য কুরআন নাযিল করা হয়েছে। আজ যে মারাত্মক মনের রোগ, অজ্ঞতার রোগ, দুনিয়া পূজার রোগ, আত্মপূজার রোগ তথা সবরকম রূহানী ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মানবজাতি, বিশেষভাবে মুসলমানের সন্তানরা ইসলামী চিন্তা, ইসলামী কালচার, ইসলামী সমাজনীতি, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী রাজনীতি বর্জন করে নানা রকম গোমরাহী যথা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি, রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্ম, সুদভিত্তিক অর্থনীতি ও পাশ্চাত্য সমাজনীতির জোয়ারে ভেসে আল্লাহ্‌র পথ ছেড়ে মানব রচিত পথ অবলম্বন করে মানুষকেই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ইলাহ বানিয়ে নিচ্ছে তার মূল কারণ কি ? এর মূল কারণ সবরকম রূহানী রোগের ঔষধ হলো কুরআন। সে কুরআন বুঝার প্রচেষ্টা বাদ দিয়েছে বলেই মানবতার এ দুরবস্থা হয়েছে। পাক কালামে আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ○

"এ কুরআনে নাযিল করা হয়েছে শেফা (রোগের ঔষধ) এবং মু'মিনদের জন্য রহমত।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮২

বলা বাহুল্য এ শেফা প্রধানত রূহানী শেফা বা মানব মনের সকল রোগের ঔষধ। কুরআন নাযিলের আসল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা ও অবহেলা করে মানুষ যদি শুধু কুরআনের ফযীলত অর্থাৎ এর নফল সওয়াব পেতে চায়। প্রতি অক্ষরে দশ দশ নেকি পাওয়ার আশা করে, সেটা কতটুকু বাস্তব। একটু চিন্তা করলে এটাও পরিষ্কার হবে যে, মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বাদ দিলে ফযীলত, ফাও বা অতিরিক্ত কখনো হাসিল হতে পারে না। মনে করুন এক মিষ্টি আলুওয়ালা প্রতিদিন বাজারে এসে তার ক্ষেতের মিষ্টি আলু বিক্রয় করে। সকাল আটটায় বাজারে এসে সারাদিন বিক্রি করে সন্ধ্যায় বাড়ি যায়, এভাবে দিনে সে একবস্তা আলু বিক্রি করে। একদিন সকাল বেলা যখন সে আলু বেঁচতে আসলো প্রথম খরিদ্দারই একবারে দু' মণ আলু খরিদ করলো। দু' মণ আলু ওজন করার পর দেখা গেল বস্তায় দু' সের আলু বেঁচে গেছে। মিষ্টি আলুওয়ালা খুশী হয়ে ঐ দু' সের আলু খরিদ্দারকে দিয়ে বললো এ দু' সের আমি আপনাকে বিনা দামেই দিয়ে দিলাম। খরিদ্দার তখন বললো আপনি যখন দু' সের বিনা দামেই দিলেন তাহলে আজ আর আমি আলু কিনবো না, এ দু' সেরই নিয়ে যাই। যে দু' মণ আলু কেনার কারণে তাকে দু' সের ফাও দিতে চেয়েছিল উনি সেই আসল দু' মণ বাদ দিয়ে শুধু ফাওটাই নিতে চান। আলু বিক্রেতা কি অতিরিক্ত আলু দু' সের খরিদ্দারকে দিবে ? না কিছু

www.pathagar.com

উত্তম মধ্যম দিবে ? উত্তম মধ্যম যাই হোক আলু যে দিবে না এটা ঠিক। এবার জ্ঞানিগণ বুঝুন কুরআন হলো আল্লাহর দেয়া বিধান। এ বিধান দেয়া হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহর গোলামরা মনিবের বিধান পড়ে সেই মতো গোলামীর আইন মেনে গোলামী করবে। বিধান মতো গোলামী করতে হলে বিধান পড়া গোলামের নিজের জন্যই প্রয়োজন। সুতরাং আইন ও যুক্তি অনুযায়ী বিধান পড়ার জন্য গোলামের কোনো মজুরী হওয়ার কথা নয়। মজুরী হবে আমল বা কাজের। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার কোনো সাধারণ মালিক নন। তিনি বিধান দিয়েছেন। বান্দা বিধান পড়ে মালিকের প্রতি কিভাবে আচরণ করতে হবে তা জানবে, মনিবের কাজ কি নিয়মে করতে হবে তা জানবে এবং মনিবের দুশমনের সাথে কি আচরণ করবে তাও জেনে নেবে। মালিক যদি বলতেন যে, বিধান পড়া বান্দা তোমার কাজ, সুতরাং বিধান পড়ার কোনো মজুরী পাবে না, এটা বলতে পারতেন, তিনি তা না বলে বললেন এ বিধান পড়ে বান্দা যদি তার বন্দেগী করে তবে আল্লাহ বান্দার কাজের মজুরীতো দিবেন, অতিরিক্ত প্রতিটি অক্ষরে দশ দশটি অতিরিক্ত সওয়াব দিবেন, এটা দিবেন, ফাও। এখন বান্দা যদি মনিবের বিধান বুঝার চেষ্টা না করে শুধু ফাও সওয়াবটুকু পেতে চায় তাহলে সেই আলু বিক্রেতা ও তার খরিদ্দারের মতো অবস্থা হবে কিনা ভেবে দেখা দরকার।

তেলাওয়াত শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য

তেলাওয়াত অর্থ পাঠ করা। আফসোসের বিষয় হলো, তেলাওয়াত শব্দ বলতেই আমরা মনে করি–না বুঝে পড়া। অথবা মনে করি–না বুঝে পড়লেও তেলাওয়াতের হক আদায় হয়। তেলাওয়াতের হক বলতে আমরা তাজবীদ ও মাখরাজই শুধু বুঝি অর্থ বুঝার প্রয়োজন মনে করি না। এ ভুলটি আমাদের মধ্যে কিভাবে আসলো ? আমি যতোদূর চিন্তা করেছি তাতে দেখেছি বহু যুগ পূর্ব হতে আমাদের সমাজে না বুঝে, দ্রুত পঠন (রিডিং) পড়া চলে আসছে। কিন্তু অন্য কোনো ভাষার ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় না যে, ভাষা বা অর্থ শেখা বাদ দিয়ে শুধু রিডিং পড়া শিখে। যখনই কেউ ইংরেজী রিডিং পড়তে শুরু করে, প্রথমেই শব্দের উচ্চারণের সাথে অর্থও শিখতে শুরু করে। এ নিয়ম ছাড়া কোথাও কোনো বিদেশী ভাষা শেখার প্রচলন দেখা যায় না, কিন্তু আরবীর ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম। এর ইতিহাস অনেক গভীরে, এটা মুসলিম জাতির জন্য একটা দুর্ভাগ্য বলতে হবে। এ প্রচলনের স্রোতে তেলাওয়াত শব্দটিই এখন না বুঝে পড়া বলে পরিণত হয়ে গিয়েছে। অন্যথায় তেলাওয়াত অর্থ না বুঝে পাঠ কিভাবে হতে পারে ? নবী সা.-এর ভাষা ছিল আরবী, মক্কার লোকদের

www.pathagar.com

ভাষাও আরবী, কুরআনও আরবী। আরবী কুরআন, আরবী ভাষীদের নিকট শুধু পড় বলাই তো যথেষ্ট। অর্থ বুঝে পড় বলার কি কোনো দরকার আছে ? কেউ যদি কোনো বাংলা ভাষী লোককে একখানা বাংলা বই পড়তে দেয়, গুরুত্বের কারণে বারবার পড়ার জন্য তাকে তাকিদ দিতে পারে, একথাতো বলবে না যে, বুঝে পড়বেন কিন্তু। না বুঝে পড়লে আসলেই তো পড়া হয় না। কাউকে যদি বলা হয় অমুক পুস্তকটি পড়েছেন ? উত্তরে যদি বলেন পড়েছি, এরপর ঐ পুস্তকের কোনো একটা ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে পাঠক যদি বলে আমি পড়েছি কিন্তু না বুঝে। তবে কি এ পড়াকে কেউ পড়া বলে স্বীকার করবে ? আরবীতে পড়াকে কেরায়াত বা তেলাওয়াত বলা হয়। গুরুত্বের কারণে বারবার তেলাওয়াতের কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ না বুঝে পড়া নয়। কারণ কুরআনে আল্লাহ নবীকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ○ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ج فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ج اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ط ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ج فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ○ ـ الاعراف : ١٧٥-١٧٦

"আর হে মুহাম্মাদ ! তাদের সামনে সেই ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করো। যাকে আমরা আমাদের আয়াত সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছিলাম। কিন্তু সে সেই আয়াতসমূহ পালন করার দায়িত্ব এড়িয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত শয়তান তার পশ্চাতে ধাওয়া করে। আর সে পথভ্রষ্টদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। আমরা চাইলে তাকে ঐ আয়াতসমূহের সাহায্যে উন্নিত করতাম। কিন্তু সেতো জমিনের দিকেই ঝুঁকে পড়ে থাকে। এবং স্বীয় নফসের খাহেস পূরণেই নিমগ্ন হয়। ফলে তার অবস্থা কুকুরের মতো হয়ে গেল। তুমি তার ওপর আক্রমণ করলেও সে জিহ্বা ঝুলিয়ে রাখে। আর তাকে ছেড়ে দিলেও জিহ্বা ঝুলিয়ে রাখে। আমাদের আয়াতসমূহ যারা মিথ্যা মনে করে অমান্য করে তাদের দৃষ্টান্ত এটাই। তুমি এ কাহিনীসমূহ তাদেরকে শুনাতে থাক। সম্ভবত তারা কিছু চিন্তা-ভাবনা করবে।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৭৫-১৭৬

আলোচ্য বর্ণনায় এটাই পরিষ্কার হলো যে, তেলাওয়াত বলতে না বুঝে পড়া বুঝায় না যেমন বাংলায় অধ্যয়ন ও ইংরেজী Study বুঝা ছাড়া হয় না।

www.pathagar.com

কুরআনের মর্ম বুঝা ও তাফসীর পড়াকে ক্ষতি মনে করা

বর্তমানে এমনও নামাযি ও পরহেজগার বলে পরিচিত ব্যক্তি দেখা যায় যারা কুরআনের অর্থ বুঝার চেষ্টা করাকে বা তাফসীর অধ্যয়নকে ঠিক বা প্রয়োজনীয় মনে করেন না। কারো ধারণা তাফসীরে বিভিন্ন মুফাচ্ছির বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন সুতরাং তা পড়লে মানুষ বিভ্রান্ত হবে। কেউ একথা সরলতার কারণে বলে ফেলে, কেউ মুখে না বললেও, কুরআনের তাফসীর পাঠ এবং দরসে কুরআনের মাহফিলের সাথে যে ধরনের আচরণ করে তাতে ঐ মনোভাব পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে। এমনও ঘটনার আমি বাস্তব সাক্ষী ঃ এ ঢাকা নগরীতেই কোনো এক মহিলা মাদ্রাসায় সপ্তাহে একদিন দরসে কুরআনের ব্যবস্থা হয়েছিল, কিছুদিন পর ঐ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের মুরব্বিরা নিষেধ করে দিলে পরে বাধ্য হয়ে তারা দরসে কুরআনের মাহফিল বন্ধ করে দেন।

যারা কুরআনের অর্থ বুঝতে এবং তাফসীর পড়তে ও দরসের মাহফিল করতে নারাজ, অর্থাৎ কুরআন বুঝতে নারাজ, তাদের এক শ্রেণীর চিন্তা হলো ঃ সাধারণ মানুষের জন্য কুরআন বুঝা সম্ভব নয়। তাদের কথার সমর্থনে কোনো যুক্তি বা দলিল আছে বলে জানা নেই। যুক্তির দৃষ্টিতে তাদের আচরণ কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। কারণ তারা একদিকে মনে করেন বঙ্গানুবাদ তাফসীর পড়লে বিভ্রান্তি আসবে, অপর দিকে তারাই প্রত্যেহ বঙ্গানুবাদ হাদীস পাঠ করেন। হাদীস এবং কুরআন উভয়ের ভাষাই আরবী, কুরআন সম্পূর্ণটাই স্বয়ং আল্লাহর ভাষা। অপর দিকে হাদীস ঃ সবগুলো হাদীসই রাসূল সা.-এর ভাষা নয়, কিছু হাদীস রসূল সা.-এর ভাষা আর কিছু সাহাবায়ে কেরামের ভাষা। হাদীস তিন রকম (১) কওলী (২) ফেলী (৩) তাকরীরি।

কওলী হাদীস ঃ রাসূল সা. যে কথাগুলো নিজ মুখে বলেছেন, সাহাবা কেরাম রা. তা মুখস্ত করে রেওয়ায়াত করেছেন, এ ধরনের হাদীসকে কওলী হাদীস বলা হয়। এর ভাষা রাসূল সা.-এর।

ফেলী হাদীস ঃ নবী সা. কাজ করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম রা. তাকে একাজ করতে দেখেছেন, পরবর্তীতে তারা নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন যে, "অমুক সময় অমুক স্থানে আমি রাসূল সা.-কে একাজ করতে দেখেছি।" অতএব রাসূল সা. যে কাজ করেছেন সেটা করা সুন্নত এবং জায়েয। এ হাদীসের ভাষা হলো ঐ সাহাবীর যিনি নিজে নবী করীম সা.-কে কাজটি করতে দেখে বর্ণনা করেছেন। একে বলা হয় ফেলী হাদীস।

তাকরীরি হাদীস ঃ কোনো একজন বা একাধিক সাহাবী রাসূল সা.-এর সামনে কোনো কাজ করেছেন কিন্তু তিনি নিষেধ করেননি। সুতরাং যখন রাসূল

www.pathagar.com

সা. নিষেধ করেননি, তখন বুঝা গেল কাজটা জায়েয। এ ঘটনা দেখে অন্য কোনো সাহাবী রা. রেওয়ায়াত করেছেন বা ঐ সাহাবী রা. নিজেই রেওয়ায়াত করেছেন। এ ধরনের হাদীসের ভাষা হলো রেওয়ায়াতকারী সাহাবীর ভাষা। এ ধরনের হাদীসকে তাকরীরি হাদীস বলা হয়।

এখন দেখুন ঃ কুরআন স্বয়ং আল্লাহর ভাষা, আর রাব্বুল আলামীন হচ্ছেন সকল ইল্‌মের উৎস, তিনিই 'আ'লা কুল্লি শাইয়্যিন আলিম', তার থেকে বড় শিক্ষক কেউ হতে পারে না। শিক্ষক যতো ভালো হন, ততো সহজ করে ছাত্রকে শিক্ষা দিতে পারেন, এতে কারো সন্দেহ থাকার কথা নয়। আল কুরআনের ভাষা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ। শুধু যে আল্লাহ ভাষা দিয়েছেন তাই নয়। আল্লাহ নিজেই কুরআন সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۔ القمر : ١٧

"আমি এ কুরআনকে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য সহজ করেছি, কে আছে বুঝতে চায়।"–সূরা আল ক্বামার ঃ ১৭

একথাটি আল্লাহ সাতাশ পারায় সূরা আল ক্বামার-এ চারবার বলেছেন। কিন্তু হাদীস সবগুলো রাসূল সা.-এর ভাষা নয়, রাসূল সা. এবং সাহাবীদের রা. মিলানো বা মিশ্র। তার মানে কুরআন আল্লাহর ভাষা, হাদীস রাসূল সা. এবং সাহাবায়ে কেরামের ভাষা। কুরআন আল্লাহর ভাষা তদুপরি আল্লাহ একে সহজ করেছেন। কিন্তু হাদীস রেওয়ায়াতকারী কেউ বলেননি যে, হাদীস এর ভাষা সহজ করা হয়েছে। এরপরও মানুষ মনে করে কুরআন তারা বুঝবে না বা বুঝতে পারবে না। অনেক মানুষকে একটি কথা বলতে শুনি যে, কুরআন বুঝা সহজ না, কুরআন আমরা সাধারণ লোক বুঝবো না। সাধারণভাবে মুসলিম সমাজে কথাটি বেশ গ্রহণীয়। মনে হয় এক দলের হওয়ার কারণে সবাই এক কথা বলে। একদল বলতে কোনো বিশেষ দলকে আমি বলি না ঃ 'এই দল', বলে অর্থ না বুঝার বা বুঝতে চেষ্টা না করার দল বলতে চাই। সবাই এক কথা বললে আল্লাহর অমোঘ নিয়ম কাউকে ক্ষমা করবে না। যদি মনে করি সকলেরই যখন এ অবস্থা তখন একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে। ব্যাপারটি আসলে এমন নয়। নিজেদেরকে যারা মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আখেরাতে নাজাত চায়। কুরআন বুঝার জন্য তারা কতোটুকু চেষ্টা করে ? না পেরে তার পরে বলে যে, "কুরআন বুঝবো না।" তারা কি সত্যিই চেষ্টা করেছে ? অথবা চেষ্টা না করেই বলে যে, আমরা কুরআন বুঝবো না। আজ যদি এ লোকদের বলা হয় যে, সৌদি আরবে একটা ভালো বেতনে চাকুরী আছে, ছয় মাসের মধ্যে আরবী কথা শিখতে পারলে

www.pathagar.com

তাদের চাকরী দেয়া হবে। তাহলে দেখা যাবে আজ যারা বলে কুরআন বুঝা সম্ভব নয়, কাল তারাই বলবে যে অবশ্যই আমরা ছয় মাসের মধ্যে আরবী ভাষা শিখে নিতে পারবো। প্রতিযোগিতা বেশী হলে তিন মাসেই পারবে কারণ এতে যে অনেক আর্থিক লাভ আছে।

যারা ভালোভাবে চেষ্টা না করেই গতানুগতিকভাবে বলে যে, কুরআন বুঝা সহজ নয়, তাদের প্রতি আমার বিনীত আরজ ঃ তারা যেন একটু চিন্তা করেন, একটু আত্মবিশ্লেষণ করে দেখেন ঃ তাদেরই ছেলে যখন ৪ বছর মাত্র বয়স হয়, ছেলের মা বলেন ওকে একটু ভালো দেখে ছবিওয়ালা বই কিনে দাও। পিতা বলেন, সে তো বড় হয়নি অযথা এতো পয়সা ব্যয় করে বই কিনতে যাবে কেন ? মা বলেন, ছবির বই হলে ছবির লোভে লোভে সে বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে, সুতরাং কিনে দাও। শুরু হলো ছবির বই এক বছর পরে তাকে ভর্তি করা হলো কিন্ডারগার্টেন স্কুলে। নিত্যদিন কাজ ফেলে মা তাকে স্কুলে দিয়ে আসেন আর নিয়ে আসেন। স্কুল মাষ্টার যখন বলেন আপনার ছেলে ভালো, তবে একটু বিশেষ যত্ন নেয়া দরকার। শুরু হলো সংগ্রাম, আম্মা আব্বা দু-জনের চেষ্টা। এরপর প্রাইভেট টিউটর ও স্কুল। ছেলের স্বাস্থ্য দুর্বল বিধায় দুধ, ডিম ও টনিক ঔষধের ব্যবস্থা। এভাবে এগার বছর মা, বাবা, মাষ্টার, টিউটর ও ডাক্তার সকলের পরিশ্রমে সে এস. এস. সি. (মেট্রিক) পাশ করলো। তারপর আরো ৬ বছরে পাশ করলো এম. এ। যদি সেশনজট হলো তো কত বছর গেল তার খবরই নেই। যাই হোক এতো লোকের চেষ্টায় ১৭ বছর পরিশ্রমে সে এম. এ. পাশ করলো।

যদি চাকুরী পেল ভালো, নয়তো বেকার। চাকুরী পেলেও ২৭ বছর পর রিটায়ার। এ ষাট-সত্তর বছরের জীবনের মাত্র সাতাশ বছরের চাকুরীর জন্য যে লেখাপড়া তার জন্য কতো চেষ্টা করা হলো, কতোজনের যৌথ চেষ্টা হলো। এখন বুকে হাত দিয়ে চিন্তা করা উচিত ঃ যারা আখেরাতের ওপর ঈমান রাখে, যারা মনে করে এ দুনিয়া কিছুই নয় আখেরাতই আসল জীবন। তাদের আখেরাতের জীবনের শিক্ষার জন্য তারা কতোটুকু চেষ্টা করেছে। কুরআন বুঝার জন্য কোনো চেষ্টা না করে উল্টো দোষ দিচ্ছে কুরআনের ওপর বা আল্লাহর ওপর যে, এ কুরআন বুঝা সম্ভব নয়। তাদের ভাবা উচিত আল্লাহ তাদের জন্য কুরআন পাঠিয়েছেন। কাজেই তাদের উপযোগী না করে পাঠাননি। আল্লাহ বলেন ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ - البقرة : ١٨٥

"রমযান মাস, এ মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে। যা সমগ্র মানবজাতির জন্য জীবনবিধান।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৫

www.pathagar.com

আল্লাহ বলেছেন, এ কুরআন মানবজাতির জন্য জীবনবিধান এবং একে সহজ করা হয়েছে। আমরা আমাদের কথা দ্বারা বা আমাদের আচরণ দ্বারা যদি বুঝাই যে, কুরআন আমাদের বুঝা সম্ভব নয়। তাহলে প্রকৃতপক্ষে (মায়াজাল্লাহ) আমরা কি আল্লাহকেই পাগল বলছি না ? মাষ্টার যদি ওয়ান-এর বই টেন-এ পাঠ্য করলে পাগল হয়, তাহলে আল্লাহ নিজে যেখানে বলছেন, 'হুদাললিননাছ'—মানবজাতির জন্য বিধান এবং উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ। আমরা যদি বলি কঠিন তাহলে আমরা প্রকারান্তরে একথাই বলছি যে, হে আল্লাহ! আপনি সহজ বললে কি হবে এটাতো আসলে কঠিন। সুতরাং না বুঝে পড়ার কাজটা আমরা করি, আর বুঝার কাজটা আপনি করুন। এ জন্যইতো আমরা না বুঝে শুধু পাঠ করি এবং কেরাত ছহি করি। কাওয়ায়েদ ঠিক না হলে অর্থ বিক্রিত হবে। তাহলে অর্থ বুঝবেন কে আল্লাহ ? আমাদের আচরণ আজ এটাই প্রমাণ করছে। যেমন বনী ইসরাঈল জাতিকে আল্লাহ যুদ্ধ করে শহর দখল করে আবাদ করতে বলেছিলেন। তারা এ কাজকে কঠিন মনে করে যুদ্ধ করার সাহসই করলো না, ফলে আল্লাহ ঐ জাতিকে অভিশপ্ত করে দিলেন। তাদের কিসমত থেকে ঐ শহর নিষিদ্ধ করে দিলেন। তেমনি যদি বর্তমান মুসলিম জাতি একটু কষ্ট স্বীকার না করে এবং চেষ্টা না করেই কুরআন বুঝা অসম্ভব মনে করে। তবে, বনী ইসরাঈলের থেকে তাদের অবস্থা অন্য ধরনের হওয়ার কোনো যুক্তি আছে কি ? আরো মজার ব্যাপার এই যে, কুরআন আরবী, হাদীসও আরবী, হাদীসের বাংলা অনুবাদ পড়ে এবং মনে করে ঠিকই বুঝে, কিন্তু কুরআনের ব্যাপারে উল্টো চিন্তা, এর কারণ কি ? সে চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করার জন্যই এ পুস্তকের অবতারণা। অতএব আসুন বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখি।

শয়তানের ষড়যন্ত্র

বর্তমান দুনিয়ায় কুরআনের কেরাতের প্রতিযোগিতার কোনো অন্ত নেই। ব্যক্তিগত উদ্যোগ, প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ, সরকারী উদ্যোগ। আন্তর্জাতিকভাবে ইসলামী সরকারগুলো পর্যন্ত কেরাত প্রতিযোগিতার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা করে থাকে। রেডিও টেলিভিশনসহ সকল মাধ্যম এগুলো প্রচার করে। কিন্তু সরকারীভাবে কুরআন বুঝার রীতি প্রচলনের উদ্যোগতো নেইই, বরং কুরআন তাফসীরের বিরুদ্ধে, সরকার অলক্ষ্যে, ইসলাম বা কুরআনী আইন বিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকাশ্যে বিরোধিতা করে। অনেক আলেম নামধারী ব্যক্তিরাও ফতোয়া দিয়ে সেই প্রচেষ্টায় সহায়তা করে। কেউ সরাসরি বিরোধিতা না করে পরোক্ষভাবে বিরোধিতা করে, যেমন বলে, আমরা তাফসীর বুঝবো না, বাংলা তাফসীর না পড়ে এ সময় তেলাওয়াত করলে বেশী

www.pathagar.com

সওয়াব হবে। তাফসীরে অনেক মতভেদ আছে সুতরাং তাফসীর পড়ে লাভ নেই, ক্ষতির আশংকা বেশী, ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয় আছে ইত্যাদি। এই যে পরোক্ষ বিরোধিতা সরাসরি বিরোধিতার চেয়ে এগুলোতে ক্ষতি অনেক বেশী। প্রকাশ্যে যারা বিরোধিতা করে তারা যে বিরোধী এটা বুঝা যায়। তাদের মুখ চেনা বিধায় জনগণ বুঝে কিন্তু ইসলামী লেবাস পরে সুন্নাতের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বেশী বেশী দীনের কথা বলে যারা বিরোধিতা করে তাদের বিরোধিতা সবচেয়ে মারাত্মক। জনসাধারণ তাদের কথাকে ইসলামী কথা মনে করেই গ্রহণ করে। এদের সবাই কিন্তু বুঝেসুঝে একাজ করেন না, অন্যের কথায় ভাল কাজ বা দীনি কাজ মনে করেই তারা হয়তো এটা করে থাকেন। যেমন আদম আ.-কে ফেরেশতা হওয়ার কথা, স্থায়ীভাবে জান্নাত পাওয়ার কথা, অনন্ত জীবন লাভের কথা বলেই ইবলিস নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল গ্রহণ করিয়েছিল। আজ সরল প্রাণ আদম সন্তানকে সেভাবেই সওয়াবের কথা বলে, দীনের কথা বলেই শয়তান এ ভুল কাজটি করাচ্ছে। সবই যে জিন শয়তান করছে তা নয় মানুষ শয়তানও করতে পারে। বড় বড় ইহুদী ধনকুবেরগণ টাকা-পয়সা ব্যয় করে মুসলমান সেজে একাজ করা বিচিত্র নয়। মানুষকে দু-রকম শয়তানই ওয়াসওয়াসা দেয় জিন এবং মানুষ। আল্লাহ নিজেই এ মানুষ শয়তানের কথা কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ○

"আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই ঐ শয়তান থেকে যে মানুষের অন্তরে ফুসলানী দেয়, সেই শয়তান জিন এবং মানুষ উভয়ই।"–সূরা আন নাস ঃ ৫-৬

আজ সারা বিশ্বের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদী চক্রান্ত তথা সি. আই. এ খুবই তৎপর, সি. আই. এ-র এজেন্ট সর্বত্র বিদ্যমান। আমাদের দেশের মুসলিম নামধারীদের মধ্যে সি. আই. এ-র টাকা খেয়ে অতি পরহেজগার সেজে ইসলামের নামে ইসলামের এবং মুসলিম জাতির ক্ষতি সাধন করার লোক থাকা অসম্ভব নয়। মীরজাফর সর্বকালের চরিত্র। ভিন দেশী গোয়েন্দা সংস্থার লোকও বাংলাদেশে থাকা আরো বেশী স্বাভাবিক। মুশরিক জাতি ইসলামের ব্যাপারে এতো জঘন্য যে প্রকাশ্যে মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির করার চেষ্টায় তারা রত। ভারত বিভক্তির পূর্ব থেকেই একদল আলেম পর্যন্ত কংগ্রেসে ছিলেন—এরা আজও আছেন। নিশ্চয়ই একটা ভুল বুঝ বা ধোঁকার মাধ্যমেই উলামাদের পর্যন্ত কংগ্রেসে রাখা সম্ভব হয়েছে। কুরআনের বুঝের এবং জ্ঞানের সাথেই ইবলিসের আসল লড়াই, অন্যথায় না বুঝে যতো সুন্দর লাহানে মানুষ কুরআন পড়ুক ইবলিসের কোনো ক্ষতি নেই। কারণ তার কাজ হলো মানুষকে ধোঁকা দেয়া। একমাত্র কুরআনই হলো তার পথের অন্তরায়। কুরআনের জ্ঞান

www.pathagar.com

যার আছে এবং আল্লাহর অনুগত থাকার সংকল্প আছে, তাকে বিভ্রান্ত করা ইবলিসের পক্ষে সম্ভব নয়। একথা স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন। অতএব জ্ঞান চক্ষু যার খোলা নেই, অর্থাৎ কুরআনী ইল্‌ম নেই। নিজে বুঝে হোক অন্যের মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা শুনে হোক বা বাংলায় তাফসীর পড়ে হোক মোটকথা কুরআনী জ্ঞান যার নেই সে ইসলাম ও কুফরের পার্থক্য বুঝে না সুতরাং তাকে ধোঁকা দেয়া সহজ। কোনো অন্ধের নিয়ত যদি ভালো থাকে সে যদি মক্কা যাওয়ার দৃঢ় সংকল্পও করে তারপরও রাস্তা না দেখার কারণে ধোঁকাবাজ শয়তান মক্কার কথা বলেই তাকে মস্কো, ওয়াশিংটন বা দিল্লী নিয়ে যেতে পারে, যেহেতু সে অন্ধ। শয়তান তার হাত ধরে যদি বলে আপনি মক্কা যাবেন, আমিও মক্কা যাচ্ছি চলুন আপনাকে হাত ধরে নিয়ে যাই। সরল বিশ্বাসে অন্ধ ব্যক্তি শয়তানের হাতে হাত দিলে শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করবে। তাকে যদি শয়তান কোনো ড্রেনে ফেলে দেয় সে হয়তো বলবে আমার কোনো দোষ নেই শয়তানটাই আমাকে ড্রেনে ফেলেছে। কথা সত্য কিন্তু ড্রেনের ময়লা তার গায়ে লাগবেই, ভুল করে ড্রেনে পড়ুক আর শয়তান ফেলে দিক। যেমন ভুল করে শয়তানের ধোঁকায় আদম আ. জান্নাত থেকে সিটকে পড়লেন। এখনও যদি সজাগ না হই তবে আমাদেরও ক্ষতির সীমা থাকবে না। কষ্টিপাথর পকেটে রেখে যদি স্বর্ণ ক্রেতা পরের কথায় স্বর্ণ মনে করে পিতল কিনে তবে তাকে তার মালিক ক্ষমা করবে কেন ? সে যদি ঠিকমত তার পকেটের কষ্টিপাথর ব্যবহারের পরও ২/১টি ভুলত্রুটি করে মালিক ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে পারেন। কিন্তু মালিক বলে দিল, তুমি কষ্টিপাথরে ঘষবে, সে কঠিন মনে করে না ঘষে পকেটে রেখে সোনার বদলে পিতল কিনলে, তার অপরাধ ক্ষমার যোগ্য হওয়া স্বাভাবিক নয়। বিভিন্ন তাফসীর বিভিন্ন মত এ অজুহাতে তাফসীর না পড়া বা কুরআন বুঝতে চেষ্টা না করা একটা মারাত্মক চক্রান্ত। সরল প্রাণ অনেক মুসলমান এ চক্রান্তের স্বীকার। অনেকের কুরআনের তাফসীর পড়ার ইচ্ছা থাকলেও ভয়ে পড়তে চায় না, কিসে কি হয়ে যায়, ভালো করতে গিয়ে মন্দের ভিতর পড়ে যায় কিনা, এটা তাদের চিন্তা। এমনিতেই মানুষ নানা কাজে ব্যস্ত তার মধ্যে তাফসীর পড়তে বা শুনতে সময় ব্যয় করবে সওয়াব তো হবে না গুনাহগার হওয়ার আশংকা। এ কাজে পাগল ছাড়া কে যেতে চায়। আল্লাহর নবী বললেন ঃ

عَلِّمُوْا وَيَسِّرُوْا ثَلٰثَ مَرَّةً

"জ্ঞান শিক্ষা দাও এবং সহজ করে দাও তিনবার একথা বললেন।" নবী সা. বললেন সহজ করে দাও। স্বয়ং আল্লাহ বলেন যে, তিনি সহজ করেছেন। এতে একথা স্বতঃই প্রকাশ পায় যে, দীনকে সহজ করা খুবই জরুরী ব্যাপার।

www.pathagar.com

যাতে আরবের লোকেরা সহজে বুঝতে পারে এজন্য আল্লাহ আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝ - حم السجدة : ٢-٣

"এটা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট হতে অবতীর্ণ আরবী কুরআন রূপে, বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।"

–সূরা হামীম আস সিজদা ঃ ২-৩

হামীম আস সিজদাহ-এর ২ ও ৩ আয়াত এবং ওপরে উদ্বৃত হাদীস থেকে বাংলায় কুরআন বুঝা এবং বুঝানো যে কতো প্রয়োজন সেটাই প্রকাশ পায়। কেউ হয়তো তর্ক বাধানোর জন্য বলতে পারেন আল্লাহ আরববাসীর বুঝ ার জন্য আরবীতে পাঠালেন আরববাসী বুঝেছেন। কাজেই আরবী কুরআন বাংলা ভাষীগণ কি করে বুঝবে। এ প্রশ্নের জবাব খুব কঠিন নয়, কেননা শেষ নবীর জামানায় লেখাপড়া ও সাহিত্যে বিশ্ব যে এতো উন্নত হবে তা ইলমে গায়েবের মাধ্যমে আল্লাহর জানা। তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় কিতাব পাঠিয়েছেন, যাতে সেই দেশের লোকেরা বুঝতে পারে। কিন্তু আখেরী জামানায় আল্লাহ একই কিতাব সারা বিশ্বের মানুষের জন্য বিধান হিসেবে দিয়েছেন। একজন মুসলমান কি এটার ব্যাখ্যা এভাবে করবে যে, বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিকট একই ভাষায় কিতাব পাঠিয়ে আল্লাহ ভুল করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ) যদি আল্লাহর ভুল ধরতে ভয় হয়, তবে মনে মনে ভুল মনে করে মুখে না বলে কি মুনাফেকী করবে? অথবা ভুল চিন্তা বাদ দিয়ে এ বিষয়টির সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। একটু ভাবলেই সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব। আধুনিক যুগে মানুষ ভাষা বিদ্যায় এতো পারদর্শী হয়েছে যে, যে কোনো ভাষায় যে কোনো দেশের মানুষ ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করছে। মজার ব্যাপার হলো, আরবী ভাষার ডক্টরেট ইংরেজরাই দেয়। অনুবাদ বিদ্যা এতো উন্নত যে, এক ভাষায় পুস্তক পৃথিবীর শত ভাষায় স্বার্থকভাবে অনুদিত হচ্ছে। এসবই আল্লাহর জানা, তাই তিনি আরবী কুরআন বিশ্বমানবের জন্য মনোনীত করে জ্ঞান-বিজ্ঞানকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। কুরআনকে তিনি এমন একখানা কিতাব হিসেবে দিয়েছেন যার তুলনা পৃথিবী কোনো দিনই স্থাপন করতে পারবে না। আধুনিক যুগে ফ্রান্সের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মরিস বুকাইলি "বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান" বই লিখে কুরআনের অতুলনীয়তা তুলে ধরেছেন। অবশেষে নিজে কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সারেন্ডার করেছেন। এসব কিছুর পরেও দুজন

www.pathagar.com

মুফাসসিরের ব্যাখ্যা বা তাফসীরে কিছু কিছু পার্থক্য থাকতে পারে। এ মতপার্থক্যকে অজুহাত হিসেবে খাড়া করে যারা কুরআন বুঝা এবং কুরআনের তাফসীর পড়া থেকে মানব সমাজকে বঞ্চিত রাখতে চায়, তাদের প্রতি আমার জিজ্ঞাসা, যদি কারো প্রিয় সন্তানের মারাত্মক ব্যাধি হয় এবং তার চিকিৎসা নিয়ে মতভেদ দেখা দেয় যে, কোন্ চিকিৎসায় রোগ ভালো হবে। এলোপ্যাথিক ডাক্তার বলে, হোমিওতে কিছু হবে না, এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করতে হবে। কেউ বলে কবিরাজ, কেউ বলে হেকিম, আবার কেউ বলে কোনো ডাক্তার নয় ঝাড়-ফুঁক হলো এ রোগের চিকিৎসা। এ মতভেদের কারণে ছেলের পিতা কি রাগ করে নিজের ছেলের চিকিৎসা বাদ দিবেন ? চিকিৎসায় যখন এতো মতপার্থক্য সুতরাং চিকিৎসাই বাদ একথা কোনো মানুষ কি কোনো দিন বলেছে ? যদি কেউ এ কারণে ছেলের চিকিৎসা বাদ না দিয়ে থাকে, তবে মতভেদের অজুহাত দিয়ে কুরআন বুঝা থেকে একজন মুসলমান কি করে বিরত থাকতে পারে ? কি করে মনে করতে পারে যে, কুরআন বুঝতে গেলে ঈমান নষ্ট হবে ? মাছ খেলে গলায় কাঁটা বিধার আশংকা আছে, তাই বলে মাছ খাওয়া কি মানুষ বাদ দিয়েছে ? দেয়নি, কোনোদিন বাদ দিবে না। কাজেই শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কুরআন বুঝে অধ্যয়ন থেকে বিরত থাকা কখনই নাজাতের সহায়ক হবে না, বরং কুরআনের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়ে সিরাতে মুস্তাকিম থেকেও বঞ্চিত হওয়ার আশংকা আছে। এ পুস্তকের পূর্বাপর আলোচনা থেকে আশা করি এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শুধুমাত্র কুরআন পাঠের পূর্বে বিতাড়িত শয়তান থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় নিতে কেন বলেছেন।

কিভাবে শয়তানের ধোঁকা বুঝা যাবে

শয়তান মানুষের নিকট কখনই প্রকাশ্যভাবে আসে না, সে আসে অদৃশ্যভাবে। তাই বলে শয়তান কখন আসে এটা কি বুঝা যাবে না ? অবশ্যই বুঝা যাবে। যেমন নামাযের সময় আল্লাহর হুকুম হলো খুশুখুজুর সাথে নামায পড়া। নামাযের ভিতর অন্য চিন্তা না করা, কিন্তু দেখা যায় নামাযের সময় ভালোভালো এবং জরুরী দীনি কথা মনে পড়ে। যেন মনে হয় এগুলোতো ভালো চিন্তাই করছি, দীনি জরুরী ব্যাপার। কিন্তু নামাযে অন্যমনস্কতা হলো, খুশুখুজু নষ্ট হলো, এটাই ছিল শয়তানের চেষ্টা। সে তার নামাযের একাগ্রতা নষ্ট করবে। সুতরাং যখনই নামাযে অন্য চিন্তা দেখা দিবে বুঝতে হবে শয়তানের ওয়াসওয়াসা শুরু হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন কাজে শয়তানের ওয়াসওয়াসা শুরু টের পাওয়া দরকার, টের পেলেই সাবধান হওয়া সহজ, মানুষ সাবধান হলে শয়তান সুবিধা করতে পারে না। শয়তান হলো

www.pathagar.com

পকেটমারদের মতো, পকেটমাররা প্রথমে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে যাতে লোকটি অন্যমনস্ক হয়ে যায়। যখন অন্যমনস্ক হয় তখন পকেট কাটলে টের পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে শয়তানও পকেটমার। পকেটমারের কাজ হলো ভরা পকেটওয়ালার পিছনে লাগা, খালি পকেটওয়ালার পিছনে সে আদৌ যায় না। এক ব্যক্তি ব্যাংকে টাকা জমা রেখে খালি হাতে চলতে শুরু করলো, অন্য ব্যক্তি চেক ভাঙ্গিয়ে লক্ষ টাকা পকেটে নিয়ে চলতে শুরু করলো, পকেটমার কার পিছু নিবে ? নিশ্চয়ই ভরা পকেটওয়ালার পিছু নিবে। কুরআন হলো জ্ঞানের ভাণ্ডার বা ব্যাংক, এখান থেকে জ্ঞান আহরণ করা মানি চেক ভাঙ্গানো, সুতরাং কুরআন থেকে কোনো ব্যক্তি জ্ঞান অনুসন্ধান শুরু করবে, এটা জানা মাত্র শয়তান তার পিছে লাগে। শয়তানের ওয়াসওয়াসা ধরার সুবিধার জন্য কুরআনের হামীম আস-সাজদা এ অংশ একটু বুঝার চেষ্টা করা যেতে পারে, তাতে শয়তান কখন আসে এটা বুঝা যাওয়ার কথা আছে।

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ط ادْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ○ - حم السجدة : ٢٤

"ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না, মন্দকে প্রতিহত করো উত্তম ভালোর দ্বারা। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে বন্ধুর মতো হয়ে যাবে।"
–সূরা হামীম আস সিজদা ঃ ৩৪

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ - حم السجدة : ٣٦

"তুমি যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা অনুভব করো (শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়) তবে আল্লাহর নিকট আশ্রয় লও, (স্মরণ লও।)"–হামীম আস সিজদা ঃ ৩৬

৩৬নং আয়াতে আল্লাহ বললেন শয়তানের কুমন্ত্রণা অনুভব করলে আল্লাহর স্মরণাপন্ন হও। শয়তানের কুমন্ত্রণা কিভাবে অনুভব করা যাবে। অনুভব যে করা যাবে সেটাও আল্লাহ নিজেই বলছেন। ৩৪নং আয়াতে আল্লাহ একটি হুকুম দিয়েছেন ও একটি ঘোষণা দিয়েছেন এবং বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, ভালো এবং মন্দ কখনো সমান হতে পারে না, সুতরাং মন্দের মোকাবেলায় তুমি মন্দ আচরণ করো না, বরং সাধারণ ভালো নয় উত্তম ভালো আচরণ করো। এর মানে একজন তোমার ক্ষতি করলে তুমি চুপ করে থাক একথা আল্লাহ বলেননি, তিনি বলেছেন তুমি উত্তম ভালো আচরণ করো অর্থাৎ যে তোমার ক্ষতি করলো, তুমি তার উপকার করো, তবেই

www.pathagar.com

সে বন্ধু হয়ে যাবে। শুধু চুপ করে থাকলে শত্রুতা না কমে বরং বাড়তে পারে। এখানে ক্ষতির মোকাবেলায় আল্লাহ তার উপকার করতে বলেছেন। এটাই হলো আল্লাহর হুকুম। যখন কোনো ব্যক্তিকে অপর কোনো ব্যক্তি ক্ষতি করবে, তখন তার মনে হওয়া উচিত যে আল্লাহ বলেছেন, "মন্দকে উত্তম ভালোর দ্বারা প্রতিহত কর।" সুতরাং সে তাই করবে। যদি তাই করে তবে এটাই হলো আল্লাহর সর্বোত্তম জিকর এবং এটাই মুত্তাকি বা মুসলিমের কাজ। অপর দিকে দেখা গেল কোনো ব্যক্তি একজন লোকের কোনো ক্ষতি সাধন করলো সংগে সংগে সেই ব্যক্তির মনে আল্লাহর এ কালাম স্মরণ না হয়ে মনের মধ্যে দারুন রাগের সৃষ্টি হলো। সে ভাবলো বেটা খুবই বেড়ে গিয়েছে, তাকে উচিত শিক্ষা না দিলে চলা যাবে না। এখানে ভালোভাবে খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে ব্যক্তির সামনে দুটি সমাধান আসলো। একটি আল্লাহর কুরআন থেকে অপরটি তার মন থেকে। কুরআনের বিপরীত যে চিন্তা বা ইচ্ছা মনের মধ্যে উদয় হলো, এটাই শয়তানের প্ররোচনা। যদি কুরআনের উল্লিখিত কথা ব্যক্তির বুঝা থাকে বা শুনা থাকে তবেই সে ধরতে পারবে কোন্‌টা শয়তানের প্ররোচনা। অন্যথায় মন যেটা বলবে সেটাকেই সে সঠিক মনে করবে। এবং মনের অনুসরণ করবে। মনের অনুসরণ করাকে কুরআনে বলা হয়েছে হাওয়ার অনুসরণ। কোনো মানুষ যখন হাওয়ার বা মনের অনুসরণ করে তখন তার হাওয়া বা মনকেই ইলাহ বানানো হয়। মনকে ইলাহ বানালে তার কালেমা ঠিক থাকে না কারণ কালেমায় সে ঘোষণা দিয়েছে, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কাউকে সে ইলাহ বানাবে না। এখন দেখুন, না বুঝার কারণে ব্যক্তি কালেমা পড়ে বিশ্বাসের ঘোষণা দিল অপরদিকে নিজের নফস বা শয়তানকে বাস্তবে ইলাহ বানালো। একথা আল্লাহ কালামে পাকে উল্লেখ করেছেন ঃ

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ط اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ○

"তুমি কি (হে নবী) তাকে দেখেছো যে তার হাওয়াকে (মনের ইচ্ছাকে) ইলাহ রূপে গ্রহণ করেছে। এ ব্যক্তির দায়িত্ব কি তুমি নিতে পার ?"

–সূরা ফুরকান ঃ ৪৩

প্রসঙ্গক্রমে অনেক দূর এসেছি। আলোচনা ছিল শয়তানের ওয়াসওয়াসা কিভাবে ধরা যাবে। আলোচনায় আশা করি এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, যখন মনের মধ্যে আল্লাহর কুরআন ও নবীর সুন্নাতের বিপরীত ইচ্ছা জাগ্রত হবে, তখন বুঝতে হবে যে, শয়তান ওয়াসওয়াসা দিতে শুরু করেছে। হাদীস শরীফে আছে একদিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-কে এক ব্যক্তি গালিগালাজ করছিল, কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. চুপ ছিলেন। নিকটেই রাসূলুল্লাহ

www.pathagar.com

সা. এ দেখে মিষ্টি মিষ্টি হাসছিলেন। একটু পরে হযরত আবু বকর রা. ঐ ব্যক্তির কথার একটি জবাব দিলেন। তখন নবী সা. মুখ বেজার করে উঠে হাটা দিলেন। এ দেখে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. নবী সা.-এর পিছে পিছে যেয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, লোকটি যখন আমাকে গালিগালাজ করছিল আপনি বসে হাসলেন, যখন আমি মাত্র একটি উত্তর দিলাম তখন আপনি মুখ ভার করে উঠে চলে আসলেন। উত্তরে রাসূল সা. বললেন, লোকটি যখন তোমাকে গালি দিচ্ছিল এবং তুমি চুপ ছিলে তখন একজন ফেরেশতা গালির জবাব দিচ্ছিল, তাই আমিও হাসতে ছিলাম। তুমি যখন জবাব দিলে, তখন ফেরেশতা সরে গেল এবং সেখানে এসে শয়তান বসলো। যেহেতু শয়তানের সামনে বসে থাকা যায় না তাই আমি হাটা দিলাম। শয়তানের ওয়াসওয়াসা কিভাবে বুঝা যাবে এ পর্যায়ে আলোচনায় যা কিছু আমরা বুঝতে পারলাম তারই আলোকে আমাদের আরচণকে আমরা খতিয়ে দেখলে বুঝতে পারবো আমরা কোন্ পর্যায়ে আছি এবং কি করছি।

আমাদের আচরণ ঃ

এক ঃ আল্লাহ কুরআনকে জীবন বিধান হিসেবে নাযিল করেছেন। সামান্য কিছু আনুষ্ঠানিক ইবাদাত ছাড়া জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকেই আমরা কুরআনকে বাদ দিয়ে নিজেদের মনের কামনা-বাসনা বা দুনিয়ার জীবনের সুযোগ-সুবিধাকেই আমাদের জীবনবিধান হিসেবে পালন করে চলছি।

দুই ঃ কুরআন সুদ মুক্ত অর্থনীতির কথা বলছে আর আমরা সুদ ভিত্তিক অর্থনীতিকে আঁকড়িয়ে ধরছি। অনেকেই আমার এ "আঁকড়িয়ে ধরছি কথাটির" প্রতিবাদ করে বলবেন, কই আমরাতো সুদ খাই না। সুদের সমাজে বাস করে আমি সুদ খাই না বললেই চলে না। আমার নিকট দুটি অর্থনীতির দাবীদার দল ভোট চায়, একটির নীতি সুদভিত্তিক অর্থনীতি। অপরটির ঘোষণা সুদ মুক্ত অর্থনীতির। আমি সুদপন্থী দলকে ভোট দিলাম। এর দ্বারা আমি কি করলাম আমিতো সুদ ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করণের হাতকে মজবুত করলাম। সেই হাত দেশে সুদের নীতি চালু করে কোটি কোটি বনী আদমকে সুদ দিতে বাধ্য করলো। আমি টের পেলাম না যে আমি কি করলাম।

তিন ঃ সমাজনীতি ও সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক ময়দানে একদলের কর্মকাণ্ড নাচ-গান, উলঙ্গপনা, বেপর্দায়ী সিনেমা-থিয়েটার, ভি. সি. আর। আমি ভোট দিয়ে তার সমর্থন দিলাম। রাজশক্তির সাহায্যে এ সকল শয়তানী কাজ দিয়ে রেডিও টেলিভিশন ভরে দেয়ার ব্যবস্থা করলাম। অপর দিকে যারা ইসলামী সমাজ কায়েম করতে চায়, যারা দারসে কুরআনের ব্যবস্থা

www.pathagar.com

করে, সীরাত সম্মেলন করে, খোলাফায়ে রাশেদার সমাজ কায়েম করতে চায় তাদেরকে অবজ্ঞা করলাম।

চার ঃ নবী সা.-এর প্রতি আল্লাহর প্রথম ওহী হলো "পড়" "পড়, তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে।" নবীর প্রথম সুন্নত হলো আল্লাহর থেকে পড়া আমি শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কুরআন বুঝা বাদ দিয়ে মিথ্যা কিসসা কাহিনী, মিথ্যা কারামত আর আউলিয়া নামের কাল্পনিক কাহিনী পড়ে জীবন কাটালাম।

পাঁচ ঃ আল্লাহ বললেন, কুরআন বুঝা সহজ, মানুষ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে বললো, কুরআন বুঝা কঠিন আর আমিও মনে করলাম কুরআন বুঝা কঠিন তাই তাফসীর পড়া বাদ দিলাম।

ছয় ঃ আল্লাহর নবী ও খোলাফায়ে রাশেদীন কুরআনী আইনে রাষ্ট্র চালালেন, দুনিয়া শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে গেল। আজ ইসলামী পুনর্জাগরণ রোধ করার জন্য শয়তান ইসলামের নাম দিল সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ। খেয়াল করলাম না, সাম্প্রদায়িকতার এ মিথ্যা নাম কারা সৃষ্টি করলো। আমেরিকা আর ভারতের উদ্ভাবিত এ মিথ্যায় বিশ্বাস করে আমার ভাইকেই দূরে সরিয়ে দিলাম। অথচ যারা মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির বানানোর চেষ্টা করে তাদের ব্যাপারে চুপ থাকলাম। এ সাম্প্রদায়িকতার কথা বিদ্রোহী কবি এভাবে তুলে ধরেছেন ঃ

বলতে পারিস বিশ্বপিতা ভগবানের সে কোন্ জাত ?
কোন্ ছেলের তার লাগলে ছোয়া অসূচী হন জগন্নাথ।
নারায়ণের জাত যদি নেই, তোদের কেন জাতের বালাই।
ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মার মুখে দিস ধুপের ধূয়া।
ভগবানের ফৌজদারী কোর্ট নেই সেখানে জাত বিচার,
পৈতা টিকি টুপি টোপর সব সেখানে একাকার।
জাত সে সিকায় তোলা রবে, কর্ম নিয়ে বিচার হবে।
বামন চাড়াল এক গোয়ালের নরক কিংবা স্বর্গে থোয়া।

সাত ঃ আল্লাহর নবী বলেছেন, কিছুক্ষণ সময় আল্লাহর দীন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করা ষাট বছর নফল নামায পড়া থেকে উত্তম। আর আমি মনে করি বাংলা তরজমা তাফসীর পড়লে লাভ নেই। এ সমুদয় চিন্তার মূল হলো শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কুরআন থেকে দূরে থাকা। অর্থাৎ কুরআনের মর্ম বুঝা থেকে সরে থাকা। কুরআনের মর্ম বুঝলে আমাদের সমাজের অধিকাংশ সরল প্রাণ মানুষ ইসলামকেই বেছে নিবে জীবনব্যবস্থা হিসেবে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে। এ সহজ ও সরল সত্যটি শয়তানের বুঝে আছে বলেই শয়তান তার চিরাচরিত পলিসি অনুসারে মানুষকে কুরআনের শিক্ষা

www.pathagar.com

লাভ থেকে বিরত রাখাই তার মূল কাজ হিসেবে গ্রহণ করেছে। অনেক আলেম নামধারী ব্যক্তিকে শয়তান এ কাজে ব্যবহার করে, মানুষকে বিভ্রান্ত করতে শুরু করেছে। তাই আল্লাহ কুরআনের বিপরীত কেউ কোনো কথা বললে তার কথা শুনতে নিষেধ করেছেন। সে যেই হোক, নবীর ছেলে হলেও তার কথা শোনা নিষেধ। কোনো বড় আলেম বা বড় বুজর্গের দাবী করে যদি কেউ কুরআন সুন্নাহর খেলাফ পরামর্শ দেয় তা গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহর বিধান স্মরণ না করে কোনো বুজর্গের স্মরণ কখনো জায়েয নেই। ইহুদী খৃষ্টানগণ আল্লাহর বিধান অনুসরণ বাদ দিয়ে তাদের আলেম, পীর ও বুজর্গদের কথা অনুসরণ করতে শুরু করেই দীনের পথ থেকে সরে গিয়ে বিভিন্ন দল ও ফিরকায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাদের লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন ঃ

اتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ - التوبة : ٣١

"তারা তাদের আহবার ও রুহবানদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়ে নিয়েছে।"–সূরা আত তওবা ঃ ৩১

আলেম, পীর ও বুজর্গদেরকে তারা আহবার ও রুহবান বলতো। এ রকম উপাধী আমাদের সমাজে প্রচলন আছে যেমন পীর, মুরশীদ, ওলিউল্লাহ (পীর আওলীয়া বলতে, তথাকথিত শরীয়ত মানে না, এমন পীর আওলীয়াদের কথা বলা হয়েছে) ইত্যাদি। হাদীস শরীফে আছে প্রখ্যাত দানবীর হাতেম তাঈয়ের পুত্র আদী বিন হাতেম যখন খৃষ্টান থেকে মুসলমান হলেন, তখন তিনি নবী সা.-কে জিজ্ঞেস করেন যে, খৃষ্টান থাকা অবস্থায় তারাতো কোনোদিন তাদের আলেম ও বুজর্গদের 'রব' বলে অভিহিত করেননি, তাহলে কুরআনের আলোচ্য আয়াতের মর্ম কি হবে ? উত্তরে রসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমরা কি তোমাদের আলেম ও বুজর্গগণ যা বলেছে তাকেই দীন বলে মনে করতে না ? হযরত আ'দী রা. বললেন, তাতো ঠিক মনে করতাম। নবী করীম সা. বললেন, এর নামই 'রব' বানানো।

আজকের মুসলিম সমাজেও দেখা যায় কোনো একটা সমস্যা বা করণীয় ব্যাপারে মুসলমানরা কুরআন কি বলে, এ চিন্তা কমই করেন। তাদের চিন্তা অমুকে কি বলেছেন, অমুক বুজর্গ বা অমুক মুরব্বি ইত্যাদি। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, কুরআনের স্থানে যেন বুজর্গ বা মুরব্বিদের আদেশ উপদেশকেই আমরা স্থাপন করে নিয়েছি। অবশ্য ইচ্ছা করে হয়তো আমরা এ অবস্থা করিনি, যেমন আদম আ. আল্লাহর হুকুম লংঘন করার নিয়ত বা ইচ্ছা নিয়ে গন্দম খাননি। শয়তানের মিথ্যা কসম ও ভালোভালো মিষ্টি কথার জালে পড়ে, ভালো মনে করেই ঐ কাজ করেছিলেন। কিন্তু ফল খাবার পরে যা হওয়ার তাই হয়েছিল। মনে হয় আমরাও অবচেতনভাবে শয়তানের মিষ্টি কথার জালে ফেঁসে যাচ্ছি।

www.pathagar.com

এ দুরবস্থা হতে বাঁচার উপায়

এ পুস্তকে যে সকল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তাতে আমাদের সমাজের আংশিক চিত্র এবং কুরআনের প্রতি আমাদের পরহেজগার বলে পরিচিত লোকদের আচরণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। অবশ্য যে সকল সচেতন ওলামা ও ব্যক্তিগণ কুরআন সম্পর্কে সচেতন তাদের প্রতি শ্রদ্ধাকে সমুচিত রেখেই আলোচনা করছি। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কোনো ভুল বুঝ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে অত্র পুস্তকের শেষ পর্যায়ে কিছু কথা বলবো। এ অধ্যায়ে আমার আলোচ্য হলো কিভাবে আমরা আমাদের চির শত্রু শয়তানের প্ররোচনা থেকে সাবধান হয়ে সিরাতে মুস্তাকিমে চলতে পারি।

মনের মধ্যে নৈরাশ্য টেনে আনার জন্য আমার আলোচনা নয়, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া ঈমানের পরিচায়কও নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, "তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হইও না।" বর্তমানে আমাদের করণীয় হচ্ছে ঃ

১. কুরআনের প্রতি না বুঝে আমরা যে অবহেলা করছি তা থেকে তওবা করা।

২. ব্যাপকভাবে কুরআনের শিক্ষাকে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা।

৩. নিয়মিতভাবে দৈনন্দিন কমপক্ষে এক ঘন্টা অর্থ সহ কুরআন তেলাওয়াত করা, আরো বেশী সময় অধ্যয়ন করা যদি সম্ভব হয় তাও করা।

৪. যে সকল দীনি পুস্তক পাঠ করলে কুরআন ও কুরআনী শিক্ষালাভ সহজ হয় ঐ সমস্ত পুস্তক পাঠ করা।

৫. যদি কুরআনের তাফসীর ও ইসলামী পুস্তক পাঠে মনে কোনো খট্‌কা আসে বা কেউ প্রশ্ন বা আপত্তি তুলে তাহলে যাচাই এবং আলোচনার মাধ্যমে এর নিরসন করা। যাচাই করা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। বাজারে জাল নোট আছে। মানুষ যাচাই করে খাঁটি নোট গ্রহণ করে। জাল নোট আছে বলে নোট গ্রহণ বাদ দিয়ে অর্থনৈতিক লেনদেন কেউ বন্ধ করে না। চোখে দেখে না এমন একজন বুড়িও যাচাই করার জ্ঞান রাখে এবং যাচাই করে গ্রহণ এবং বর্জন করে থাকে। মনে করুন চোখে কম দেখে এমন একজন বুড়িকে দোকানদার একটি পঞ্চাশ টাকার নোট দিল। বুড়ির চোখের দৃষ্টি কম তাই সে বুঝতে পারে না আসলে সেটি পঞ্চাশ টাকার নোট কিনা। বুড়ি এখন কি করবে, বাজার করবে, না কেনাবেচা বাদ দিবে ? অবশ্যই নয়, বুড়ি পঞ্চাশ টাকার নোট কিনা এটা যাচাই করবে। পথচারী একজনকে জিজ্ঞেস করবে বাবা দেখতো এটা কত টাকার নোট ? পথচারী বললো বুড়িমা এটা পঞ্চাশ টাকার নোট। অতপর যদি দেখা যায় যে, পথচারী ঐ দোকানের ভিতরে ঢুকলো এবং দোকানদারী শুরু করলো। বুড়ির মনে সন্দেহ লোকটি

www.pathagar.com

দোকানদারের লোক সুতরাং অপর একজন পথচারীকে জিজ্ঞেস করলে সেও বললো এটা পঞ্চাশ টাকার নোট। অতপর রাস্তা দিয়ে চলে গেল। বুড়ি বুঝতে পারলো ইনি দোকানদারের লোক নয়, সুতরাং বুড়ির সন্দেহ দূর হলো। প্রয়োজনে সে আরও লোককে দেখাবে তবুও তাকে টাকার লেনদেন করতেই হবে।

৬. কোনোক্রমেই দীনি ইল্‌ম অর্জন বন্ধ করা যাবে না। দীনি ইল্‌ম অর্জনের গুরুত্ব কতো তা বুঝতে পারি আল্লাহ নবীর প্রতি ওহী নাযিল শুরু করলেন প্রথমে সূরা ফাতেহা দিয়ে নয়, সূরা এখলাস, সূরা ইয়াসিন, আয়াতুল কুরসী, সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত, কোনোটাই নয় বরং শুরুতেই বললেন 'পড়'। কুরআনে একটি সূরার নাম আর রাহমান। এ সূরায় আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তার রাহ্‌মানিয়াতের একটি ফিরিস্তি দান করেছেন। এ ফিরিস্তির প্রথমেই স্থান পেয়েছে ঃ

اَلرَّحْمٰنُ ○ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ○

"দয়াময় মেহেরবান, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।"

–সূরা আর রহমান ঃ ১-২

মানুষের প্রতি আল্লাহর যতো দয়া তার যে লিষ্ট তার প্রথমেই স্থান পেয়েছে 'আল্লামাল কুরআন'। ইল্‌ম অর্থ জ্ঞান। আল্লামাল কুরআন অর্থ কুরআন রূপে জ্ঞানদান করেছেন। আদম সৃষ্টির প্রথমেই আদম আ.-কে আল্লাহ যা দান করেছেন তাহলো। وَعَلَّمَ اٰدَمَ "আমি আদমকে জ্ঞানদান করলাম।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৩১

স্বয়ং রসূল সা. বলেন ঃ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَةٌ

"প্রত্যেক ঈমানদার নরনারীর জন্য ইল্‌ম হাসিল করা ফরয।"

একটি উক্তি যাকে অনেকে হাদীস বলেন, অনেকে বলেন হাদীস নয়, আরবী উক্তি তাহলো ঃ সুদূর চীন গিয়ে হলেও ইল্‌ম অর্জন কর" চীনের কথা বলায় এখানে চীন দেশের গুরুত্ব প্রমাণ করার কোনো কারণ নেই, তদানিন্তন সময়ে আজকের মতো প্লেন, মটর, ট্রেন, জাহাজ ছিল না, ফলে চীন দেশে যাওয়া এক অসাধ্য সাধন বলে মনে হতো। চীন যাওয়ার কথা বলে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, চরম কষ্ট ও চীন যাওয়ার মতো অসাধ্য সাধন হলেও ইল্‌ম হাসিল করো। উল্লিখিত দুটি আয়াত ও দুটি হাদীস থেকে 'ইল্‌মের' গুরুত্ব এতোবেশী বুঝানো হয়েছে যার কোনো তুলনা হতে পারে না। ইল্‌ম হাসিলের পদ্ধতি নিয়ে ইল্‌ম হাসিলের সহজতা বা সুবিধা নিয়ে কেউ মতপার্থক্য করতে পারে। অমুক আলেম ভালো শিখাতে পারেন একথা বলা যেতে পারে কিন্তু নির্ভেজাল কুরআনী শিক্ষার বিকল্প কোনো শিক্ষা বা কোনো

www.pathagar.com

কিতাবের কথা বলা, কুরআন সুন্নার দৃষ্টিতে কিছুতেই গ্রহণীয় হতে পারে না। কুরআন চর্চা এবং কুরআন থেকে শিক্ষার গুরুত্ব কমে এমন কোনো কিতাব বা এমন কোনো উপদেশ কিছুতেই মানা যেতে পারবে না। এ ধরনের প্রচেষ্টা হয় মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করার জন্য অথবা মুসলমানদেরকে শয়তানের অনুগত বানিয়ে জাহান্নামে নেয়ার জন্য। উদাহরণ স্বরূপ একজন মুমূর্ষ রুগীর আত্মীয়-স্বজন তার ভালো চিকিৎসার লক্ষ্যে ডাক্তার নিয়ে মতপার্থক্য করতে পারে। কিন্তু এ মতপার্থক্যের কারণে কেউ যদি চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তাকেই অস্বীকার করে তাহলে তাকে মনে করতে হবে যে, সে মানুষের আদি দুশমন শয়তানের সাথী। সে রুগীর প্রাণের শত্রু। অনুরূপ যদি কেউ মতপার্থক্যের কারণে কুরআনের মর্ম শিক্ষাকে বাদ দিতে বলে তাহলে সেও বুঝে হোক আর না বুঝে হোক ইসলামের ধ্বংস সাধন করছে। সরলতার কারণে শয়তানের ধোঁকা টের না পেয়েও হয়তো অনেকে এ কাজ করতে পারে। তাদের উচিত হবে দূরে না থেকে কুরআন বুঝার চেষ্টা করা। তাদের প্রতি আহ্বান হলো আসুন সকলে মিলে কুরআন বেশী বেশী চর্চা করে শয়তানের জারিজুরি খতম করি। শয়তান বেশী ভয় করে কুরআনের শিক্ষাকে। কারণ আল্লাহ স্বয়ং বলে দিয়েছেন, যারা এ হুদা বা কুরআন অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নেই, কোনো চিন্তা নেই।

৭. সকলের উচিত দেশের স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটিতে যাতে কুরআনের শিক্ষা বিস্তার লাভ করতে পারে সেই দিকে নজর দেয়া। যদিও এটা সরকারের কাজ। জনগণের ভোট দিয়েই সরকার। ৮৫% ভাগ মানুষ হলো কুরআনে বিশ্বাসী। তাঁরা যদি একবার জেগে উঠে তাহলে সরকার কুরআন শিক্ষার বিপরীত শিক্ষাব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে পারবে না।

৮. কুরআনের সাথে সাথে অর্থসহ হাদীস অধ্যয়ন করা।

৯. যতোদিন পর্যন্ত দেশে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হবে ততোদিন বেসরকারী প্রচেষ্টায় কুরআনের তাফসীর, হাদীসের তাফসীর এবং ইসলামী সাহিত্য ইত্যাদি ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার এ ছোট্ট পুস্তকখানাকে সেই প্রচেষ্টারই অংশ হিসেবে কবুল করুন, আমীন।

কতিপয় প্রশ্নের উত্তর

১ ॥ প্রশ্ন ঃ ফেরেশতাদের এ আশংকার কি কারণ ছিল যে, তারা বললো আদম ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে ?

উত্তর ঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বললেন যে, তিনি দুনিয়ায় খলিফা পাঠাবেন। তিনি একথা বলেননি যে, দুনিয়ায় 'নাস' বা মানুষ পাঠাবেন।

www.pathagar.com

এ খলিফা শব্দটির অর্থই ফেরেশতাদেরকে এ প্রশ্নের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে, এটা বুঝা যায়। খলিফা শব্দের অর্থ হলো প্রতিনিধি। প্রতিনিধি তাকেই বলে যার নিরংকুশ স্বাধীনতা নেই, শর্ত সাপেক্ষে স্বাধীনতা। ইংরেজীতে যাকে বলে Delegated Power বা Discretionary Power। যেমন ধরুন, একজন ব্যাংক ম্যানেজারের Discretion হলো যে, সে এক লক্ষ টাকা T. O. D. দিতে পারবে। কিন্তু তার ইচ্ছেমতো নিয়মে নয় বা তার মনমত ব্যক্তিকে নয়। কিভাবে দিবে, কাকে দিবে এ ব্যাপারে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাকে নিয়ম জানিয়ে দিয়েছে। (মানুষকেও আল্লাহ এ রকম নিয়ম বলে দিয়েছেন যে, সে তার ক্ষমতা কিভাবে ব্যবহার করবে। এ নিয়মের নাম 'হুদা' বা জীবনব্যবস্থা এবং এটাই কুরআন শরীফ) ঐ নিয়ম অনুযায়ী যদি ম্যানেজার কাজ করে তবে ব্যাংক ঠিক মতো চলবে, ম্যানেজারের চাকুরীও বহাল থাকবে এবং তার যথানিয়মে প্রমোশন হবে। এ নিয়মের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ তার হাতে ব্যাংকের চাবি এবং লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে দেন। ম্যানেজার ইচ্ছে করলে বেআইনিভাবে এ নিয়ম ভঙ্গ করতে পারেন, এ সুযোগ তাঁর আছে। যদি ম্যানেজার এ কাজ করেন তাহলে ব্যাংক ব্যবস্থায় অবশ্যই বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। ঠিক সেই নিয়ম অনুসারে ফেরেশতাগণ খলিফা শব্দ শুনে বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ায় এমন একটি জাতি সৃষ্টি করবেন যাদের ঐরকম শর্ত সাপেক্ষে স্বাধীনতা থাকবে এবং ইচ্ছে করলে তারা অন্যায়ভাবে আল্লাহর দেয়া বিধানের বিপরীত ঐ ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ নিতে পারবে। আর যদি এ সুযোগ মানুষ অন্যায় পথে গ্রহণ করে, তাহলে দুনিয়ায় বিশৃংখলা দেখা দিবে। দুনিয়ায় বিশৃংখলা মানে মানব সমাজে বিশৃংখলা, মানব সমাজের বিশৃংখলাই হলো ফাসাদ আর এ ফাসাদের পরিণতি হলো রক্তপাত। অতএব ফেরেশতাগণ খলিফা শব্দ থেকে ফাসাদ এবং রক্তপাতের আশংকা করেছিলেন, এটা সহজে বুঝা যেতে পারে।

২ ॥ **প্রশ্ন ঃ** ফেরেশতাগণ বললেন ঃ "আপনার তাসবিহ ও পবিত্রতা বর্ণনাতো আমরাই করছি।"

উত্তর ঃ মানুষ পাঠানোর পিছনে আল্লাহর পরিকল্পনা কি ছিল এবং কেন আল্লাহ মানুষ পাঠাচ্ছেন এর উদ্দেশ্য কি, কিছুই ফেরেশতাদের জানা ছিল না বা জানার কথাও নয়। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, "আমি যা জানি তোমরা জান না।" ফেরেশতারা ইতিপূর্বে যা কিছু দেখেছে তাহলো ঃ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

"আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবাই আল্লাহর তাসবিহ করে।"–সূরা আল হাদীদ ঃ ১

www.pathagar.com

স্বাভাবিকভাবেই ফেরেশতাদের ধারণা যে, সৃষ্টিকুলের কাজ হলো শুধু আল্লাহর প্রশংসা এবং তাসবিহ করা। এ তাসবিহ, সৃষ্টির সবাই করছে। বৃক্ষলতা, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, আসমান-জমিন সকলেই তাসবিহ করছে। তাসবিহ এবং প্রশংসার কাজ এমন সৃষ্টি দ্বারা হচ্ছে যাদের দ্বারা কোনো ফাসাদ বা রক্তপাতের শংকা নেই। তাই তাদের কথা হলো "আপনার প্রশংসা ও তাসবিহ আমরাই করছি" এ উক্তির দ্বারা তাদের এ ভাবই প্রকাশ পেল যে, মানব সৃষ্টির প্রয়োজন ও বাস্তবতা তাদের বুঝে আসেনি। এটা ফেরেশতাদের কোনো আপত্তি নয় বরং মনের প্রশ্ন। উত্তরে আল্লাহ বললেন যে, তিনি যা জানেন ফেরেশতাগণ তা জানেন না। তার অর্থ এভাবে বুঝা যায়, আল্লাহ তাঁর উত্তরের মাধ্যমে ফেরেশতাদের একথাই বললেন যে, অন্যান্য সৃষ্টি দেখে ফেরেশতাগণ যে ধারণা করেছেন এ ধারণা ঠিক নয়। মানুষ অন্যান্য সৃষ্টির মতো নয়। মানুষকে শুধু তাসবিহ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি, মানুষের জন্য বিশেষ একটি কাজ আছে, তার নাম খেলাফত। একাজ অন্য কোনো সৃষ্টির দ্বারা সম্ভব নয়। একাজ ছাড়া মানুষের কামিয়াবী নেই। অনেকে আজ তার আসল খলিফার কাজ বাদ দিয়ে জংগলে, আস্তানায়, হুজরায় বসে শুধু তাসবিহ করাকেই কামালিয়াত মনে করেন। সাধারণ মুসলমানগণও তাই মনে করেন। বিবেক-বিবেচনা এতদূর পৌঁছেছে যে, নামায-রোযা বাদ দিয়ে পাগলের বেশে বস্তা পরে থাকলে আরও বেশী কামেল মনে করে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ, আল্লাহর ফরয লংঘনকারী এক ব্যক্তিকে সমাজ আজ কামেল মনে করে। অবশ্য যদি প্রকৃতই মস্তিষ্ক বিকৃত রুগী হয় আর উলঙ্গ থাকে তবে তার ওপর রাগ নয় করুণা ও দয়া হতে পারে। এসবই কুরআনের উপদেশ থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে হয়েছে। যা হোক কথা প্রসঙ্গে অনেক দূর এসে গিয়েছি, মোটকথা শুধু তাসবিহ ও পবিত্রতা বর্ণনায় রত থেকে যে কামালিয়াত সেটা হবে গাছ, পাথর, পাহাড়, নদী ইত্যাদির কামালিয়াত। আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের যদি এতে কামালিয়াত হতো তবে আল্লাহ বলতেন না ঃ

اِنِّىْ اَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ-

"আমি যা জানি তোমরা তা জান না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৩০

একথার দুটি অর্থ প্রথমত, মানুষের কাজ, মানুষের যোগ্যতা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই অন্য সকল সৃষ্টি থেকে আলাদা যা এখনও অন্য সৃষ্টির নিকট প্রকাশ করা হয়নি। দ্বিতীয়, মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টির মতো শুধু তাসবিহ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। ফেরেশতাদের বুঝ এবং অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তারা প্রশ্ন করেছেন, মানব সৃষ্টির প্রশ্নে কোনো আপত্তি তোলেননি। আপত্তি তোলার এখতিয়ার কারো নেই।

www.pathagar.com

৩॥ প্রশ্ন ঃ আল্লাহ ফেরেশতাদের উত্তরে একথা কেন বললেন না যে, তার খলিফা রক্তপাত ঘটাবে না বা ফাসাদ করবে না শুধু বললেন আমি যা জানি তোমরা তা জান না ?

উত্তর ঃ এ প্রশ্নের উত্তর খুব সংক্ষেপ। সেটা হলো মানুষের দ্বারা ফাসাদ ও রক্তপাত হওয়া অসম্ভব হলেতো আল্লাহ বলতেন যে, তাঁর খলিফা রক্তপাত করবে না। কিন্তু ব্যাপার আলাদা, মানুষের ব্যাপারে যেমন বলা যায় না যে, তারা ফাসাদ বা রক্তপাত করবে না। তেমনি একথাও বলা যায় না তারা রক্তপাত করবে। কারণ মানুষ যদি আল্লাহর বিধান মতো এবং আল্লাহর দেয়া ওহীর ইল্‌ম অনুযায়ী চলে, তবে বিশ্বে ফাসাদ, রক্তপাত আসবে না, আসবে শান্তি। যদি মানুষ আল্লাহর বিধান বর্জন করে অন্য কারো বিধান বা মতবাদ অনুযায়ী চলে তবে সর্বত্র দেখা দেবে ফাসাদ ও রক্তপাত। কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ-

"জলে-স্থলে অন্তরিক্ষে যে অশান্তি ফাসাদ এগুলো মানুষের হাতের কামাই।"–সূরা আর রূম ঃ ৪১

আজ দেশে দেশে যে অশান্তি এর কারণও তাই। এজন্য আল্লাহ তা'আলা কথার মাধ্যমে ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একটা বাস্তব নমুনা দেখালেন। অর্থাৎ আদম আ.-কে সমস্ত জিনিসের জ্ঞানদান করে ফেরেশতাদের সম্মেলন ডেকে প্রমাণ করে দিলেন যে, তিনি আদম আ.-কে শুধু খেলাফতই দিবেন না বরং এমন জ্ঞান দান করবেন, যে জ্ঞান ব্যবহার করলে বিশ্বে বিরাজ করবে শান্তি। যদি আদম সন্তান আল্লাহর দেয়া জ্ঞান বা আসমানী কিতাব বাদ দিয়ে অন্য মতবাদ বা মনমতো চলে তবেই আসবে ফাসাদ। তাই আল্লাহর একথা যথার্থ "আমি যা জানি তোমরা তা জান না।"

৪ ॥ প্রশ্ন ঃ "আল্লাহ আদমকে সেজদা করার হুকুম শুধু ফেরেশতাদের দিয়েছিলেন ইবলিসকে দেননি।"

উত্তর ঃ এ প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে কিছু উল্টোপাল্টা কথা সমাজে প্রচলিত আছে। সূরা আল বাকারায় আদম আ.-এর এ ঘটনার উল্লেখ করে আল্লাহ বলেছেন, "যখন তোমাদের রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে খলিফা পাঠাতে যাচ্ছি।" এখানে যখন তোমাদের রব ফেরেশতাদের বললেন। একথাকে কেন্দ্র করে লোকেরা ধরে নিল যে, আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে আদম আ.-কে সেজদা করতে বলেছেন, ইবলিসকে বলেননি। অপর দিকে সেজদা না করার কারণে ইবলিসকে লা'নত দিলেন। সুতরাং তারা প্রচার করলো ইবলিস পূর্বে ফেরেশতাদের সরদার ছিল এবং তার নাম ছিল আজাজিল

www.pathagar.com

ফেরেশতা। এ আজাজিল এবং ফেরেশতাদের সরদার কথা দুটি কখন কোথা হতে এলো এটা আমার জানা নেই। তবে ইসরাঈলী কোনো কাহিনী থেকে হয়তো কেউ এ ধারণা আমদানী করে থাকতে পারেন।

পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, ইবলিস জ্বিন। আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ط

"এবং স্মরণ করো, আমি যখন ফেরেশতাগণকে বলেছিলাম, আদমকে সিজদা করো, সকলেই সিজদা করলো কিন্তু ইবলিস সিজদা করলো না। সে জ্বিনদের একজন, সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো।"–সূরা আল কাহাফ ঃ ৫০

কুরআনের এ আয়াত পড়ার পর ইবলিস ফেরেশতা ছিল একথা বলার কোনোই অবকাশ থাকতে পারে না। কিন্তু নিশ্চয় সকলেই স্বীকার করবেন যে, সমাজে একথার ব্যাপক প্রচার আছে যে, ইবলিস ফেরেশতা ছিল। ইল্‌ম বা জ্ঞানের দিক থেকে মুসলিম সমাজের অবস্থা কতো মারাত্মক যে, ঘরে ঘরে কুরআন বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এবং কুরআনে পরিষ্কার একটা কথা থাকার পরও মুসলিম সমাজে এর বিপরীত কথা ঘরে ঘরে প্রচলিত। লোকে বলে পুরা পাতিলের ভাত টিপতে হয় না, একটি ভাত টিপলেই পুরা হাড়ীর ভাতের খবর বলা যায়। এভাবে ইসলামের অনেক মৌলিক শিক্ষার বিপরীত শিক্ষা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে আছে বা প্রচলিত হতে চলেছে। আমি এ পুস্তকে কষ্টিপাথর পকেটে রেখে সোনার বদলে পিতল খরিদের কথা ঠিকই বলেছি, না ভুল বলেছি, তা যাচাই হয়ে গেল। এ রকম আমি অনেক উদাহরণ দিতে পারবো। যার মাধ্যমে দেখা যাবে কুরআন হাদীসের কথা এক রকম, আর আমাদের ধারণা বা বিশ্বাস সম্পূর্ণ অন্য রকম। আমরা ছোট বেলায় ব্যাপকভাবে শুনেছি এমন কি আমার মা (খুবই একজন পরহেজগার মহিলা ছিলেন আল্লাহ তাকে জান্নাত নসীব করুন) ছোট বেলায় আমাকে শিখিয়েছেন ফরয হলো ১৩০টি, এটা যে মুখস্ত রাখবে সেই পার হতে পারবে। আমাকে মুখস্ত করানো হয়েছিল—"এক শত ত্রিশ ফরয না জানবে যে, আখেরে মুসলমান না হবে সে।" কোথা হতে আসলো এ ১৩০ ফরযের সংখ্যা ? কে এর আবিষ্কারক ? কোনো হাদীস খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইসলামের প্রতিষ্ঠিত সত্য হলো আল্লাহ যা করার হুকুম করেছেন তাই করা ফরয। আল্লাহ মাতা-পিতার সাথে ভাল আচরণ করতে হুকুম করেছেন মাতা-পিতার সাথে উত্তম

www.pathagar.com

আচরণ করা ফরয। মাতা-পিতার সাথে উত্তম আচরণের কথা ঐ ১৩০ ফরযের মধ্যে নেই। অপর দিকে রসূল সা -এর চার কুরসী চার ফরয বলা আছে। এ চার কুরসী হলো রসূল সা.-এর চারজন পূর্ব পুরুষের নাম ঃ (১) আবদুল্লাহ (২) আবদুল মোত্তালিব (৩) আবদুল হাসেম, (৪) আবদুল মানাফ। এ চারজনের তিনজন নবী সা. জন্মের অনেক পূর্বেই ইনতেকাল করেছেন। কার কি ঈমানের অবস্থা ছিল আমাদের সঠিক জানার মতো তথ্য ও দলিল নেই, তাদের নাম জানা ফরয। কুরআন হাদীসে নেই, কে এ চার ফরয আবিষ্কার করলো, কোনো হাদীস নেই। বলা হয়েছে চার মাযহাব চার ফরয অথচ মাযহাব সৃষ্টি রাসূল সা., সাহাবী বা তাবেঈন কারো দ্বারা হয়নি পরবর্তী ইমামদের সময় থেকে এটার শুরু হয়েছে। মাযহাব চারটা না হয়ে দশটাও হতে পারতো। কিয়ামত পর্যন্ত হয়েও যেতে পারে। বর্তমানেই ৫টি মাযহাব আহলে হাদীসগণ মাযহাব অস্বীকার করেও হয়ে আছে এক মাযহাব। এসব কেমন করে হলো? কোন্ ডাক্তার করবেন এ রোগের প্রতিরোধ? এ সমস্ত সৃষ্টির মূলে কি শয়তান নেই? সে শয়তান জিন থেকেই হোক আর মানুষই হোক। ১৩০ ফরয বানানো অর্থ কি এ নয় যে, ইসলামকে ছেটে কেটে কাট টু সাইজ করে নতুনভাবে ঢালাই করা? মোটকথা রোগের মূল অনেক গভীরে সুতরাং সচেতন মুসলমান ভাইদের প্রতি নির্বিশেষে আমার আহ্বান এবং আবেদন আসুন আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে এ মারাত্মক উল্টো স্রোতের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যাই, অন্যথায় আমরা ভেসে যাব মিথ্যার সয়লাবে। অতীত জাতি-সমূহের খাতায় বা লিষ্টে আমাদের নামও যোগ হয়ে যাবে। বনী ইসরাঈলের ওলামাদের লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন ঃ

يٰبَنِيٓ اِسْرَآئِلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ○ - البقرة : ٤٠

"হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আমি তোমাদের দান করেছিলাম, আমার সাথে তোমাদের যে অংগীকার ছিল তা পূর্ণ করো, তাহলে তোমাদের সাথে আমার যে অংগীকার ছিল তা আমি পূর্ণ করবো। এবং তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয় করো।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ৪০

وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ز وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ○ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ - البقرة : ٤١-٤٢

"(হে বনী ইসরাঈল) সামান্য দামে আমার আয়াত বিক্রি করো না আমার গযব থেকে আত্মরক্ষা করো। মিথ্যার সাথে মিশিয়ে সত্যকে সন্দেহযুক্ত

www.pathagar.com

করো না এবং জেনেবুঝে সত্যকে গোপন করো না।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ৪১-৪২

উল্লেখিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের আলেমদেরকে কয়েকটি কথা বলেছেন ঃ (১) আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করা, (২) আল্লাহর সাথে দেয়া অংগীকারকে তারা পূর্ণ করলে আল্লাহও তাঁর দেয়া অংগীকার পূর্ণ করবেন, (৩) তারা যেন সামান্য বা স্বল্পমূল্যে আল্লাহর আয়াতকে বিক্রি না করে। কিন্তু বনী ইসরাঈল আল্লাহর এ আহ্বানে সাড়া দেয়নি ফলে আল্লাহ্ এ জাতির ওপরে চাপিয়ে দিয়েছেন অপমান ও লাঞ্ছনা এবং তারা আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হয়েছে। (১) কি নিয়ামত আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলকে দিয়েছিল, (২) কিভাবে তারা আল্লাহর দেয়া অংগীকার ভংগ করেছে তাদের প্রতি আল্লাহর কি অংগীকার ছিল, (৩) সামান্য মূল্যে তারা কিভাবে আল্লাহর আয়াত বিক্রি করেছে। এ প্রশ্নগুলোর উত্তর এ পুস্তকে স্থানাভাবে দেয়া সম্ভব হলো না। পরবর্তী পুস্তকে এর ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য কতিপয় আয়াত

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ط أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ - البقرة : ١٧٠

"যখন তাদের বলা হয় আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তোমরা অনুসরণ করো, তারা বলে, না, না, বরং আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তার অনুসরণ করবো। এমন কি, তাদের পিতৃ পুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝতো না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না তথাপিও ?"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৭০

আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈলদের নীতি তুলে ধরা হয়েছে। তারা জীবন বিধান হিসেবে কিতাবের ওপর ঈমান এনেছিল কিন্তু অজ্ঞতা তাদের ওপর এভাবে ক্রমে ক্রমে চেপে বসেছিল যে, তারা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করা বাদ দিয়ে পূর্ব পুরুষের রসম-রেওয়াজ বা সমাজের প্রচলিত পন্থায় চলতে শুরু করে। আল্লাহর নবীদের পক্ষ থেকে বারবার তাদের তাকিদ দেয়া সত্ত্বেও তারা রেওয়াজের এতো ভক্ত হয়ে যায় যে, তাদের পূর্ব-পুরুষের এ রেওয়াজ আল্লাহর বিধানের বিপরীত কিনা সেটা যাচাই করে দেখতেও তারা নারাজ। এ সমস্ত নীতি ও আচরণের কারণে বনী ইসরাঈলদের প্রতি আল্লাহর গযব হয়েছে। কারণ তারা কিতাবের কিছু অংশ গ্রহণ করেছে এবং কিছু অংশ বাদ দিয়েছে ঃ

www.pathagar.com

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ ط ـ البقرة : ٨٥

"তোমরা কিতাবের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ অমান্য করবে ? তোমাদের মধ্য থেকে যারাই এমনটি করবে তাদের শাস্তি এছাড়া আর কি হতে পারে যে, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হবে এবং আখেরাতে তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।"

বর্তমানে মুসলমানদের অনেকের মধ্যে এ অবস্থা বিরাজিত। তাদের নিকট যখন আল্লাহর কুরআন থেকে কথা পেশ করা হয়, তারা কুরআনের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে নিজেদের দল, ফিরকা, মাযহাব, মুরব্বি, পূর্বপুরুষ, পীর ইত্যাদির কথা বলে কুরআন থেকে মুখ ফিরায়। তাদের কথা হলো তাদের এ সকল ব্যক্তিত্ব বা দল যা বলে তাই তারা করবে। তাদের সামাজিক রীতিনীতি বা বংশীয় রেওয়াজকেই তারা বেশী গুরুত্ব দিবে। তারা মুখে সত্য প্রত্যাখ্যান করার কথা বলে না, বাস্তবে সত্যকে গ্রহণও করে না। অবশ্য কুরআনের যে সকল কথা তাদের পার্থিব স্বার্থের অনুকূল সেগুলো গ্রহণ করে এবং ফলাও করে দেখায় যে, তারা ইসলামকে কতো ভালোবাসে। কিন্তু যখন ইসলামের হুকুম মানলে তাদের আর্থিক ক্ষতি বা অন্য কোনো স্বার্থের ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে তখন তারা কুরআনের বিধান গ্রহণ করতে রাজি হয় না। যদি জিজ্ঞেস করা হয়, কুরআনের সবটুকুর প্রতি তাদের ঈমান আছে কিনা ? উত্তরে তারা দাবী করবে যে, পূর্ণ কুরআনের ওপরই তাদের ঈমান আছে। এ অবস্থা একটা জাতির জন্য খুবই মারাত্মক। মুখে বলে পূর্ণ কুরআনে ঈমান আছে কাজে-কর্মে বিপরীত। কর্মক্ষেত্রে জেনেশুনে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে স্বার্থের ক্ষতি না হয় বা কোনোরূপ ঝুঁকি নিতে না হয় এ নীতিতে তারা কাজ করে। এতে এক সাথে দুটি মারাত্মক অবস্থা তাদের প্রকাশ পায়। একটা হলো তারা দুনিয়ার স্বার্থে জেনেবুঝে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য বিধান, রেওয়াজ বা মনের কামনা-বাসনার অনুসরণ করে এটা কুফরী। বাস্তবে করে একরকম মুখে বলে অন্যরকম এটা মুনাফেকী। আজ মুসলিম সমাজের এই যে অবস্থা একটা জাতির পতনের জন্য এটাই হলো বড় কারণ।

আল্লাহ আমাদের সকলকে অনুরূপ অবস্থা থেকে হেফাযত করুন।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি
  - খন্দকার আবুল খায়ের
- ভোট দিব কাকে ও কেন
  - খন্দকার আবুল খায়ের
- দার্শনিক শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র) ও তাঁর চিন্তাধারা
  - জুলফিকার আহমদ কিসমতি
- ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মীয়তা
  - এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম
- ভাল মৃত্যুর উপায়
  - এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম
- ইসলামের চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
  - এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম
- ইসলামের দৃষ্টিতে এইডস্ রোগের উৎস ও প্রতিকার
  - এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম
- স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও ইসলাম
  - ডাঃ মুহাম্মদ গোলাম মুয়াযযাম
- কুরআন হাদীসের আলোকে শহীদ কারা
  - মাওলানা আবদুল মতিন বিক্রমপুরী
- কুরআন হাদীসের আলোকে লাইলাতুল বরাত ও লাইলাতুল কদর
  - মাওলানা আবদুল মতিন বিক্রমপুরী
- শাহাদাত অনিবার্ণ
  - মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম
- ইসলামী আন্দোলনের অতীত বর্তমান
  - মাওলানা খলিল আহমদ হামেদী
- কুরআন কি আল্লাহর বাণী নয়?
  - আতাউর রহমান সিকদার
- ভোটের ফযীলত
  - আবদুল গাফফার
- একটুখানি মিষ্টিহাসি ও ইসলামী আন্দোলন
  - সিরাজুল ইসলাম মতলিব
- ইসলামী আন্দোলনের আতীত বর্তমান
  - মাওলানা খলিল আহমদ হামেদী

www.pathagar.com